সমন্বয়

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

বসন্ত সংখ্যা

৬৭তম সংস্করণ বৈশাখ ১৪৩৩ (এপ্রিল ২০২৬)

শুভ নববর্ষ

সমন্বয়

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ১

সংঘ বার্তা ১

ভ্রমণ কাহিনী

বিশ্বের উন্নত দেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্স (তৃতীয় পর্ব) - তপন চ্যাটার্জী ২

কিন্নর-ভ্রমণের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত - তনুকা ভৌমিক এন্দ ৯

অতুলনীয় টার্কি (তৃতীয় পর্ব) - দেবদত্ত ১৬

বিজ্ঞান

পার্কার সোলার প্রোব - (দ্বিতীয় পর্ব)) - বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ১১

কবিতা

বর্তমান যুগের ছড়া - কালীসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬

রম্য রচনা

বিরহ - দয়মন্তী ২৫

ইতিহাস

শহরতলি থেকে শহর - গার্গী চট্টোপাধ্যায় ৪৪

স্মৃতিকথা

রঙের পথে পথে (তৃতীয় পর্ব)- সনৎ চক্রবর্তী ৩১

গল্প

এক টাকায় ভগবান - নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য ৭

জীবন অপরাহ্নে - বিপ্লব দাশগুপ্ত ১৯

লাল শাড়ির মৃত্যু নেই (শীত সংখ্যার পর) - শ্রাবণী চ্যাটার্জী ২৭

আশ্বাস - শিপ্রা অধিকারী ৩৬

পাপ-পুণ্য - কালীপদ চক্রবর্তী ৩৯

পাত্র চাই / পাত্রী চাই ২৬, ৩৮

সম্পাদক - শুভময় চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

বর্ষা, শরৎ ও শীতের পর বসন্ত সংখ্যার সঙ্গে সমন্বয়ের নব পর্যায়ে ত্রৈমাসিক চক্র সম্পূর্ণ হল। ধারাবাহিক ও নিয়মিত লেখক লেখিকা ব্যতিরেকে আমরা দীর্ঘদিন পর তনুকা ভৌমিক এন্দ ও গার্গী চট্টোপাধ্যায়কে পেয়ে গর্বিত।

পাঠকদের মতামত আমরা পত্রাকারে জানতে উৎসুক।

সংঘ বার্তা

নয়ডা কালীবাড়ি অনুষ্ঠানসমূহ ঃ জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৬

কল্পতরু উৎসব ঃ রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লির অমূল্য সহযোগিতায় এনবিসিএ ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে কল্পতরু উৎসব ২০২৬ আয়োজন করে। রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লির সম্মানীয় স্বামী জ্যোতিস্বরূপানন্দজি মহারাজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভক্তদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সারদার জীবন ও উপদেশ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

পৌষমেলা ও বইমেলা ২০২৬ ঃ ১০ ও ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পৌষমেলা ও বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছিল সাহিত্য আলাপচারিতা এবং বিভিন্ন প্রকাশনার স্টল। দর্শনার্থীরা পুলি-পিঠের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ঐতিহ্যবাহী সংক্রান্তির স্বাদ গ্রহণ করেন। এ বছর প্রথমবারের মতো একটি রান্না প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

সরস্বতী পূজা ঃ প্রতি বছরের মতো ২৩ জানয়ারি ২০২৬-এ সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী পূজা সম্পন্ন হয়। বহু শিশু 'হাতেখড়ি'-র মাধ্যমে শিক্ষার দীক্ষা গ্রহণ করে। ভক্তদের মধ্যে ভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মহাশিবরাত্রি ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে মহাশিবরাত্রি পালন করা হয়। সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ভক্ত মন্দিরে আসতে থাকেন। দেররাত পর্যন্ত মন্দিরে মহাশিবরাত্রি পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বেদান্ত সন্ধ্যা ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির পূজ্য তেজোময়ী মা ও বেদপ্রাণা মা কালীবাড়ি মন্দিরে বেদান্ত দর্শনের উপর মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপনা করেন।

বসন্ত উৎসব ঃ ২ মার্চ ২০২৬ তারিখে দোলপূর্ণিমার সঙ্গে বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয়। দর্শনার্থীরা মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। পূর্ণিমা পূজা শেষে ভোগ প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

'সৃজনী' - এনবিসিএ স্কুল অফ মিউজিক, ডান্স অ্যান্ড আর্টস ঃ ২০ মার্চ ২০২৬ থেকে কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে 'সৃজনী' তার কার্যক্রম শুরু করল। এখানে সব বয়স ও স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শাস্ত্রীয় সংগীত, কত্থক, ভরতনাট্যম, তবলা, সেতার, সন্তুর, কিবোর্ড এবং চারুকলার পাঠদান চালু হয়েছে। যোগ্য শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের যথাযথ সার্টিফিকেশনের দিকে পথনির্দেশ করবেন।

বাসন্তী দুর্গাপূজা ঃ ২৪-২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে ঐতিহ্যবাহী নিয়মে বাসন্তী দুর্গাপূজা পালিত হয়। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। সকল ভক্তকে ভোগ প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পূজা ঃ প্রতি মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তরা পূজায় অংশগ্রহণ করে ভোগ ও প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিশ্বের উন্নত দেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্স

তৃতীয় পর্ব

তপন চ্যাটার্জী

বেলা একটার সময় হোটেল থেকে রওনা হয়ে কিংস ক্রস পৌঁছে গেলাম ট্রেন ছাড়ার বেশ কিছু সময় আগে। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঠিক দুটোর সময় ট্রেন ছাড়ল। আমাদের ব্রিটেনবাসের বেশির ভাগ সময় কাটবে টাইন নদীর পাড়ে নিউক্যাসলে। নিউক্যাসল আপন টাইন পৌঁছতে ট্রেন পনের মিনিট সময় বেশি নিয়েছে। শনিবার ও রবিবার দিন অনেক সময় বেশি লেগে যায় কারণ এই দুই দিন রেল লাইনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলে এবং অনেক ঘুরপথে আসতে হয়।

নিউক্যাসল আপন টাইন রেল স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে চলে এলাম জেসমন্ডের রোজবেরী হোটেলে। হোটেলের মালিকের নাম পেনী। ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় আমাদের ছয়জনের থাকার ব্যবস্থা এই হোটেলে। হোটেলের মালিক পেনী, হোটেলের রিসেপশনিস্ট পেনী আবার বোধহয় পরিচারিকাও। পেনী অনেক কাজ করতে পারে। একের মধ্যে বহুর প্রকাশ। এইটা দেখে আমার অবাক হওয়া উচিত ছিল না। আমাদের সব দেব-দেবীকে দেখেছি কখন কখন সংহাররূপে আবার কখন দেখেছি শান্তি সংস্থাপনায় আবার কখনও দেখেছি অন্য কোনো রূপে। তবে এরকম জাগ্রত মানবী দেবী আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হল না। আমাদের লাউঞ্জে নিয়ে এসে বলল, 'তোমাদের সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে আপাতত তোমাদের মধ্যে দুজনকে আমাদেরই অন্য হোটেল ফার্ণে যেতে হবে। আমার স্বামী ফার্ণ-এর মালিক। তিন চার দিন পর আবার এই দুজনকে এখানে ফিরিয়ে আনব। তখন তোমরা ছ'জন একসঙ্গে থাকতে পারবে।' রোজবেরীর যে ঘর আমাকে দেখানো হল তা আমার পছন্দ না হওয়ায় আমি প্রথম তিন চার দিন ফার্ণেই থাকব ঠিক করলাম। এরপর অন্যরা কে কোন ঘরে থাকবে তা ঠিক হয়ে গেল।

জেফের সঙ্গে পরিচয় হল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার্স ডিগ্রি প্রাপ্ত জেফ এক কোম্পানীতে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার। একই সঙ্গে হোটেলের ব্যবসাও চালাচ্ছে। ভেবে অবাক হলাম একই সঙ্গে দুই বিপরতীধর্মী পেশায় কি করে একজন নিযুক্ত থাকতে পারে। জেফ যদি শুধু হোটেলের মালিক হত এবং ম্যানেজার রেখে হোটেল চালাত তাহলে এত বিস্ময়ের কিছু থাকত না। আসলে এদেশে সবাই 'মেনি ইন ওয়ান'। হোটেল চালানোর জন্য জেফকে অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। ফার্ণ হোটেল রোজবেরীর থেকে বেশি দূরে নয়। জেফ আমাদের দুজনকে পৌঁছে দেবে। তার আগে রোজবেরীর লাউঞ্জে বসে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে। জেফ বেশ আলাপী ও বিনয়ী। পেনীও আলাপী, কিন্তু যেন একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এই রকম এক সময়ে এক কাপ করে চা হলে ভালো লাগত যদিও আমার বলতে সংকোচ বোধ হচ্ছে। শর্মাজীর বোধহয় আমার থেকে একটু বেশি চা তেষ্টা পেয়ে থাকবে। তাই বলেই ফেলল যে এক কাপ করে চা হলে ভালো হত। চা-এর অনুরোধ করায় পেনী খুশি হল মনে হল না।

চরিত্রগতভাবে পেনী সেই যাকে ইংরেজিতে বলে 'ডমিনেটিং পার্সোনালিটি', একদম সেই রকম। তাই কিছুটা অপ্রসন্নভাবে উত্তর দিল, 'এই সময় আমাদের

হোটেলে চা পরিবেশন করার নিয়ম নেই। তবে তোমরা আজ প্রথম এসেছ তাই আজ চায়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এরপর কিন্তু অন্য কোনো দিন দিতে পারব না।' এরপর চা করা হল এবং চা খাওয়া শেষ হলে জেফ তার গাড়িতে আমাকে ও প্রকাশ সাহেবকে ফার্ণ হোটেলে নিয়ে গেল।

জেফ অনেক কথা বলতে পারে আর প্রাণ খুলে হাসতে পারে। হোটেলে যাওয়ার সময় এই দুটো হোটেলই যে জায়গায়, সেই জেসমন্ডের দোকান বাজার সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল। ফার্ণের যে ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল তাতে টেলিভিশন এবং অন্যান্য আসবাবপত্র থাকলেও ঘরটা ছোট হওয়ায় আমার মনঃপূত হল না। তিন চার দিন পর রোজবেরী হোটেলে একটা ভালো ঘর পাব এটাই একটা সান্ত্বনা। কিছুক্ষণ টেলিভিশন দেখে ঠিক করলাম আজ রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুতে চলে যাব। এর পরদিন থেকে শুরু হবে আমাদের অফিসের কাজ। ইংল্যান্ডে টেক অ্যাওয়ে রেস্টোরান্ট আমাদের মতন অল্প বাজেটের ভ্রমণকারীর জন্য স্বল্প মূল্যে খাওয়ার জায়গা। টেক অ্যাওয়ে রেস্টোরান্ট ও আমরা যেন 'মেড ফর ইচ আদার'। আমরা একে অপরের জন্য বেঁচে আছি। হোটেলের কাছাকাছি এই রকম এক বাংলাদেশী রেস্টোরান্টের সন্ধান দিয়েছিল জেফ। হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে চলে গেলাম আল হালাল টেক অ্যাওয়ে রেস্টোরান্টে। এই ধরণের রেস্টোরান্টে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না, তাই বলা হয় টেক অ্যাওয়ে। আমি সস্তার মধ্যে দেড় পাউন্ড অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে সবজি দিয়ে তৈরি ভেজিটেবল পোলাও নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সাড়ে নটার মধ্যে খাওয়া শেষ। ভাবলাম শুতে যাব। কিন্তু তখন দিনের আলো রয়েছে। সূর্যের শেষ রশ্মির রেশ তখনও মিলিয়ে যায়নি। একটা উপায় বের হল। জানলার ভারী পর্দা টেনে দিতেই ঘরের ভেতর বেশ রাতের মতন হয়ে গেল। ঘরের ভেতর কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করে শুয়ে পড়লাম। এই হোটেলে বাথরুম টয়লেট ঘরের সংলগ্ন নয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম। চিরকালের অভ্যেস অফিস যাওয়ার আগে সব প্রাত্যহিক কাজ এবং স্নানটাও সেরে নেওয়া। ব্যবস্থার অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ অসুবিধে অবশ্য হল না। তারপর ডাইনিং হলে এলাম ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্ট তৈরি করে টেবিলে পরিবেশন করছে দুজন সুন্দরী তরুণী। মনে হল এদের একজনের বয়েস তিরিশ পেরিয়েছে। অন্যজন কুড়ি বাইশ হবে। আমাদের দেশে সাদা চামড়ার কদর আর বিদেশে কদর বাদামী রঙের। সুন্দর ফর্সা রঙ রোদে বসে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করতে না পারলে মেমসাহেবদের শান্তি নেই এদিকে সূর্যদেবতা বড়ই কৃপণ। তাঁর দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া বেশ ভাগ্যের ব্যাপার। ইংল্যান্ডের আগস্ট মাসের আবহাওয়া সব চেয়ে সেরা। গত বারো-চোদ্দ বছরের তুলনায় এই বছর সব থেকে ভালো আবহাওয়া পাওয়া গেছে। তার জন্য সবাইয়ের মন আনন্দে খুশিতে ভরে আছে। ইংল্যান্ডে দুই এক মাসের স্বল্পকালীন গ্রীষ্মকাল। বাকি সময়টা হয় ঝিরঝিরে বৃষ্টি অথবা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ অথবা দারুণ ঠান্ডা এবং সেই সঙ্গে বরফপাত। বছরের বেশি ভাগ সময়ের জন্য প্রয়োজন সূর্যতাপের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা। প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে বিদ্যুৎ চালিত সানবেড। বাজারে বিভিন্ন রকমের ক্রীম ও লোশন পাওয়া যায়। তাই মেখে সানবেডে শুয়ে পড়তে হয়। বাইরে বৃষ্টি অথবা বরফপাত আর ঘরের মধ্যে কৃত্রিম সূর্যতাপের বিকল্প ব্যবস্থা। একেই বলে বিদেশ।

যে মেয়েটি অল্পবয়সী তার সাদা চামড়ার রঙে মনে হল ট্যান করার জন্য বাদামী রঙের আস্তরণ পড়েছে। ভাবলাম আলাপ করা যেতে পারে। কিন্তু আজ সময়ের বড় অভাব। অন্য কোনো এক দিন করা যাবে। আজ তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে হেঁটে চলে এলাম রোজবেরী হোটেলে। কিছুক্ষণের মধ্যে টেলিকমিউনিকেশনস কনসালন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম 'মার্জ অ্যান্ড ম্যাকলেলান' থেকে দুজন দুটো গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। একটা গাড়িতে আমি ও আমার দুজন সহকর্মী উঠলাম। অন্য গাড়িতে আমার অন্য তিনজন সহকর্মী। আমাদের যেতে হবে নিউক্যাসল-এর কিলিংওয়ার্থ অঞ্চলে।

আমার মনে হল আমি যে গাড়িতে উঠেছি সেই গাড়ি চালাচ্ছেন ডক্টর ব্রুস। কারণ আমি ডক্টর ব্রুসকে ঠিকমতো না চিনলেও আমি এই ফার্মের অন্য একজন

ইঞ্জিনিয়র মিস্টার রেডশকে ভালো রকম চিনতাম এবং ডক্টর ব্রুসেরও আসার কথা ছিল। অন্য গাড়িটা চালাচ্ছেন মিস্টার রেডশ। সুতরাং মনে হল আমি নিশ্চয়ই ডক্টর ব্রুসের গাড়িতে উঠেছি। গাড়িতে উঠে একটু গণ্ডগোল করে ফেললাম। সামনের সীটে বসলে এদেশে সীট বেল্ট বাঁধতেই হয়। অনভ্যস্ত হাতে তা করতে গিয়ে সফল হচ্ছিলাম না। ডক্টর ব্রুস পরিস্থিতি সামাল দিতে খুব ভদ্রভাবে বললেন, 'নট রিয়্যালি লাইক দ্যাট।' তারপর অবশ্য নিজেই বেল্টটা বেঁধে নিতে পেরেছিলাম।

ডক্টর ব্রুস প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এই ফার্মের কাজকর্মের বিষয়ে কিছু বলতে শুরু করলেন। কথায় কথায় বললেন, 'আপনারা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কাজ করে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাবেন। দেখবেন আমাদের দেশে কাজের সময় সবাই মন দিয়ে কাজ করে। কিন্তু বাকী সময়টা বিশেষ করে শনিবার ও রবিবারের উইকএন্ড উপভোগ করার সময়। অবসর সময় আমাদের নিউক্যাসলেও অনেক জায়গায় বেড়াতে যেতে পারবেন যেমন ভালো ভালো বাজারে ও সমুদ্রতীরে। এছাড়া দূরে যেতে চাইলে স্কটল্যান্ড অথবা লেক ডিস্ট্রিক্টসে বেড়াতে যেতে পারবেন।'

ভদ্রলোকের কথাবার্তা খুব সুন্দর। বেশভূষায় যথেষ্ট পরিপাটি। অন্তত একশ কিলোমিটার গতিতে শহরের মধ্যে গাড়ি চলছে। রাস্তার দুপাশে সারি সারি দোতলা অথবা তিনতলা বাড়ি। সব বাড়ি দেখতে প্রায় একই রকম। কেন জানি না এক বিশেষ ডিজাইনের বাড়ি প্রায় সারা ইংল্যান্ড জুড়ে। বাড়ির দরজা জানালা এমনকি জানলার পরদার সাদা কাপড় প্রায় একই রকমের। পথে যেতে যেতে দিল্লির গোল চক্করের মতন এক জায়গায় গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল। এখানে না আছে কোনো ট্র্যাফিক লাইট না খুব কাছাকাছি কোনো গাড়ি। ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা গাড়ি আমাদের ডান দিক দিয়ে সম্ভবত ঘন্টায় একশ কিলোমিটারের বেশি গতিতে চলে যেতেই আমাদের গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। ডক্টর ব্রুস বোধহয় আমার মনের কথা বুঝে থাকবেন। তাই নিজের থেকেই বললেন, 'আমাদের দেশে খুব দ্রুত গতিতে গাড়ি চলে তাই আমরা গিভ প্রিসিডেন্স টু দ্য ভেহিকল অন ইওর রাইট, নিয়মটা দারুণভাবে মেনে চলি।' আমি ভাবলাম আমাদের দেশে তো সব কিছুই ফ্রিস্টাইল ব্যাপার। সব বিষয়ে যেনতেন প্রকারেণ এগিয়ে চল। নিয়ম আছে নিয়মভঙ্গের প্রতিযোগিতায় নাম লেখানোর জন্য। ডান দিকের গাড়িকে আগে যেতে দেওয়ার দায় কারোর নেই।

এখন কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে এক জোড়া আট তলা বাড়ি। ডক্টর ব্রুস বললেন, 'আমরা এসে গিয়েছি। সামনের জোড়া আট তলা বাড়িটা দেখছি তার নাম এমবারলি। আমাদের অফিস এই বাড়িতে।'

চারিদিকে দোতলা তিনতলা বাড়ির মাঝখানে এমবারলির এই বহুতল বাড়ি কেমন যেন একটু বিসদৃশ লাগছে। আমি জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, 'চারিদিকে দোতলা তিনতলা সুন্দর সুন্দর বাড়ির মাঝখানে এই রকম সামঞ্জস্যহীন বহুতল বাড়ি কেন নির্মাণ করা হল তা বুঝতে পারলাম না। ডক্টর ব্রুস উত্তর দিলেন, 'অনেক আগে এই অঞ্চলে আরও কয়েকটা বহুতল বাড়ি ছিল এবং আরও কয়েকটা নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। আমাদের দেশে পরিবেশ রক্ষার ও নান্দনিকতা বজায় রাখার জন্য নিয়ম আছে। অনেক আগে কি করে নির্মাণ করা হয়েছিল তা আমার ঠিক জানা নেই। পরে সেই সব বহুতল বাড়ি ভেঙে দেওয়া হল। সেই জমিতে নতুন দোতলা অথবা তিনতলা বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এত বাড়ি যে ভেঙে দিলে তার জন্য অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আর ক্ষতি স্বীকার করলেই তো এমবারলিকে রেখে দিলে কেন?' ডক্টর ব্রুস উত্তর দিলেন, 'একটা ভুলের মাসুল দিতে কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হল। কিন্তু আমাদের এমবারলি কেন ভাঙ্গা হল না তা আমার জানা নেই। হয়তো এটা হতে পারে যে এই বাড়িটা এমন জায়গায় যে বিশেষজ্ঞদের চোখে ততটা খারাপ লাগেনি। তবে এই বাড়ি যদি কোনো দিন ভেঙ্গে দেয় তো আমি বিস্মিত হব না।'

কথা বলতে বলতে আমরা কিলিংওয়ার্থে এমবারলির সামনে পৌঁছে গিয়েছি। গাড়ি থেকে নেমে বললাম, 'ডক্টর ব্রুস অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। এরপর টেলিকমিউনিকেশনসের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার সময় আপনার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হবে।'

— না না, কোথাও একটা ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।

— ভুল, আমার ভুল, একথা কেন বলছেন ডক্টর ব্রুস?

আমাদের গাড়ি যিনি চালিয়ে নিয়ে এসেছেন তিনি বেশ একটু অপ্রস্তুতের মতন বললেন, 'আমি ডক্টর ব্রুস নই। আজ বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় ডক্টর ব্রুস আসতে পারেননি। আমি এই ফার্মের স্যোফার। গত দশ বছরের ওপর আমি এই ফার্মে গাড়ি চালাচ্ছি।'

এখন আমার সত্যিই অবাক হওয়ার পালা। একজন গাড়ির চালক যে তার পোশাকে, চাল চলনে এত পরিপাটি হতে পারে, এত মার্জিত স্বভাবের হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

লিফ্‌টে ফোর্থ ফ্লোরে চলে এলাম। সেখানে আমাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার জন কাহিল একটা ট্রলিতে কিছু বই নিয়ে এলেন। তারপর ছেষট্টি বছরের যুবক ইঞ্জিনিয়র বার্কার সাহেব কিছু ড্রয়িং সীট নিয়ে প্রবেশ করলেন। এদেশে কোনো কলিং বেল নেই, পিওন নেই। যত উচ্চপদেই চাকুরীরত হোক না কেন নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়। ইতিমধ্যে রেডশ সাহেব আমাদের প্রত্যেককে ভেন্ডিং মেশিনের একটি করে কার্ড দিয়ে বললেন, 'এই কার্ড ব্যবহার করে অটোমেটিক মেশিন থেকে পছন্দ মতন গরম চা কফি চকোলেট এবং ঠান্ডা কোকাকোলা অরেঞ্জ ফ্যান্টা এই সব খাওয়া যেতে পারে। একটা কার্ডে আশি কাপ পানীয় পাওয়া যায়। তারপর নতুন কার্ড নিতে হবে।' রেডশ সাহেব বলে দিলেন যে ইচ্ছা করলে আমরা দুপুরের সময় অফিসের ক্যান্টিনে লাঞ্চ করতে পারি। অবশ্য অফিসের ক্যান্টিন খুব ছোট এবং বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। প্রয়োজনে বাইরের দোকানে গিয়ে খাওয়া যেতে পারে। খুব কাছে আছে মরিশনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। এই দোকানে জামা কাপড় ছাড়া অন্য সব কিছু পাওয়া যায়।

এর আগের কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝেছি যে সকালের ব্রেকফাস্টের পর এই দেশের লোকের সামান্য কিছু খেলেই চলে। সুতরাং 'যস্মিন দেশে যদাচার'। আমরা সকলে মেনে চলি 'ঈট লাইক এ কিং'। তারপর দুপুরে কাছাকাছি যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে নিই। শর্মাজীর অসুবিধে মনে হয় আমাদের সবাইয়ের চেয়ে বেশি। শর্মাজী নিরামিষাশী। একে তো এদেশে ভেজিটেরিয়ান খাবার বেশ কষ্টসাধ্য। তার ওপর শর্মাজীর মনে যদি একবার সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে ভেজিটেরিয়ান নামে যা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে নিষিদ্ধ কিছু মেশানো থাকতেও পারে তাহলে তার ধারে কাছে থাকবে না। আমি এবং দুজন চৌধুরী মাছ ভাতের ভক্ত। এখানে সহজে পাই না বলে তার আশা ত্যাগ করেছি। শর্মাজী মনে আশা থেকে যায় কাছাকাছি কোথাও পরাঠা ও সব্জী পাওয়া যাবে।

দেশ থেকে রওনা হওয়ার আগে ঠিক করেছিলাম যে অন্তত রাতের রান্না সবাই মিলে এক সঙ্গে করার ব্যবস্থা করব। যে হোটেল দুটোয় আমরা ভাগাভাগি করে আছি তাতে সেই রকম সুযোগ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

প্রথম দিন অফিস শেষে নিউক্যাসল শহর ও টাইন নদী ও চারপাশের উইয়ার অঞ্চলের সব জোনের বাস ও আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনের মাসিক টিকিট ফোর লেন এন্ডস মেট্রো স্টেশন থেকে কিনে নিলাম। এই মাসিক টিকিটে যতবার খুশি ও যেখানে খুশি যাওয়া যায়। আলাদা করে টিকিট কিনে যেতে গেলে খরচ অনেক বেশি। এই রকম এক ব্যবস্থায় আমার অনেক সুবিধে হল। মনের আনন্দে টাইন নদীর পাড়ে ও উইয়্যার ভ্যালীতে ঘুরে বেড়াব। নিউক্যাসল টাইন নদীর পাড়ে, আর এখান থেকে পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটার দূরে উইয়্যার নদীর পাড়ে সান্ডারল্যান্ড। নিউক্যাসল থেকে বোল্ডনের কোলিয়ারি অঞ্চলের উপর দিয়ে ব্রিটিশ রেলের ট্রেন যায় সান্ডারল্যান্ডে। ট্রেন ছাড়া বাসেও যাওয়া যায়। টাইন নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত নর্থ শীল্ড থেকে প্রায় জাহাজের মতন বিশাল মোটর লঞ্চেও যাতায়াত করা সম্ভব। অর্থাৎ বাস, মেট্রো, ব্রিটিশ রেলের কিছু অংশের ট্রেন ও নিকটবর্তী অঞ্চলের টাইন নদীর ওপর মোটর লঞ্চে যাতায়াত করা যায় এই একটা টিকিট দিয়ে। চার সপ্তাহের এই টিকিটের মূল্য ছাব্বিশ পাউন্ড আশি পেন্স। এছাড়া প্রথম বার এক পাউন্ড ফটো তোলার জন্য। যে কর্মচারী আমাদের টিকিট দিলেন তিনিই ফটো তুলে নিলেন বোধহয় পোলারয়েডের মতন কোনো ক্যামেরা দিয়ে।

প্রথম দিন অফিস থেকে ফেরার পথে শহরের মধ্যস্থিত এলডন স্কোয়ার মার্কেটে আমরা কজন ঘুরে বেড়ালাম। তারপর রাতের খাবার এক রেস্টোরান্টে খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলে ঘরের মধ্যে একটা টেলিভিশন থাকায় সময় কাটানোর কোনো সমস্যা নেই। ইচ্ছে করলে হোটেলের লাউঞ্জে বসে বড় রঙিন টেলিভিশন দেখা যেতে পারে। ঘরের টিভি খোলা আছে। চোখের সামনে একটা চ্যানেলে একটা অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। আমার তখন সেদিকে মন নেই। আমাকে দেশ দেখতে হবে। শুধু চোখের দেখা নয়। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। এই দেশের টেলিকমিউনকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং এ যে উন্নতি হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করার চেষ্টা করতে হবে। একই সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রগতির পিছনে যেসব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ তা অনুধাবন করতে হবে।

কয়েকদিন হল নিউক্যাসল এসেছি। এখানে এসে পর্যন্ত আমাদের হোটেলের সমস্যা থেকেই গেছে। আমাদের চারজন এক হোটেলে আর দুজন অন্য হোটেলে আছি। ভোজনং যত্রতত্র চলছে। এ নিয়ে জেফ ও পেনীর সঙ্গে আমাদের মন কষাকষি শুরু হয়ে গেছে। একদিন কিছুটা জোরের সঙ্গে জেফকে বললাম, 'আমরা বেশ কয়েকদিন হল এই হোটেলে এসেছি। এবার রোজবেরীতে আমাদের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা কর।'

কথাটা জেফের বোধহয় মনঃপুত হয়নি। উত্তরে বলল, 'কেন তোমাদের কি এই হোটেলে খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'আমাদের একই হোটেলে থাকার কথা। এছাড়া তোমার হোটেলের ঘর খুব ছোট, সেই জন্য ঘরের ভাড়াও নিশ্চয়ই কম। তোমাদের অন্য হোটেলের ঘর এর চেয়ে অনেক বড়। একটানা তিন মাস থাকতে হলে এর থেকে বড় ও সুন্দর সাজানো গোছানো একটা ঘরের প্রয়োজন আছে।'

জেফ সেদিনও হেসে উত্তর দিল, 'তোমরাও পেশায় ইঞ্জিনিয়ার আর আমিও পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তোমাদের সুবিধে অসুবিধে দেখা আমার বিশেষ উচিত। তবে আমি একবার পেনীর সঙ্গে কথা বলে দেখি। আমি ও আমার স্ত্রী দুজনে দুটো হোটেল আলাদা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালাই।'

আমি বললাম, 'একটু তাড়াতাড়ি করতে পারলে ভালো হয়।'

এর পরদিন দেখলাম জেফের মুখের স্বাভাবিক হাসি কোথায় উবে গেছে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই বলল, 'গতকাল সারারাত টিভি চলার আওয়াজে তোমার পাশের ঘরের এক বৃদ্ধার ঘুম হয়নি।'

বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, 'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার কথায়। আমি সারা রাত টিভি দেখিনি, অল্প সময় দেখেছিলাম কম জোরে। তা সত্ত্বেও সেই বৃদ্ধার যদি অসুবিধে হয়ে থাকে তা হলে আমাকে তখনই বলা উচিত ছিল। আমি টিভির ভলিউম আরও কম করে দিতে পারতাম। তবে এই জন্য আমি দুঃখিত।'

সেদিন অফিসে এসে শুনলাম রোজবেরির পেনীও একই অভিযোগ করেছে আমাদের শর্মাজীকে। বোঝা গেল এ হল আমাদের একই হোটেলে থাকার ইচ্ছে প্রকাশের জবাব।

এর মধ্যে পেনী রাতে তার হোটেলের রান্নাঘরে দেড় ঘন্টা সময় দিয়েছিল একসঙ্গে রান্না করে খাওয়ার। সেই রান্না ঘরে যা বাসনপত্র তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তার ওপর পেনীর শ্যেনদৃষ্টি। ঠিক সাড়ে আটটায় রান্না ঘর পরিষ্কার করে বেরিয়ে আসতে হবে। এই ব্যবস্থা ঠিকমতো মেনে নিতে না পারলেও তখনকার মতন রাজী হলাম যত দিন না ব্রিটিশ কাউন্সিল অন্য ভালো ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

এর মধ্যে এই হোটেলে যে দুজন মেয়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। এই দেশের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে যথেষ্ট ভদ্র ও উপকারী। রাস্তায় চলার পথে যদি কখনও মনে হয়েছে কোনো বিষয়ে কারোর সাহায্যের প্রয়োজন তাহলে সেই সাহায্য অনায়াসে পাওয়া গেছে। পাশে এসে সহাস্যে বলেছে, 'মে আই হেল্প ইউ?' বিভিন্ন সময়ে এগিয়ে এসেছে তরুণ তরুণী বৃদ্ধ বৃদ্ধা নির্বিশেষে। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রমী অল্প সংখ্যক উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং পাঙ্ক ও স্কিনহেডরা।

(ক্রমশঃ)

এক টাকায় ভগবান

নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য

বিলুর মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল শেষ পর্যন্ত। বেশ কিছুদিন শয্যাগত ছিল বিলুর মা মালতী। পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তার বনমালী বসাকের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু অসুখ আর সারে না। বস্তির সবাই বলল, 'এভাবে বাড়িতে ফেলে রাখলে একে বাঁচান যাবে না।' তাই সবাই মিলে এক রাতে বিলুর মাকে শিবু কর্মকারের টোটোয় উঠিয়ে রেখে এল সরকারি হাসপাতালে। সেখানে ডাক্তাররা রক্ত, মল-মূত্র পরীক্ষা করে বললেন, 'অনেক দেরি করে ফেলেছ তোমরা। একে অপারেশন ছাড়া বাঁচান যাবে না। টাকার জোগাড় কর তোমরা।'

'কত টাকা লাগবে ডাক্তারবাবু?' জিজ্ঞেস করল বস্তির একজন।

'সরকারি হাসপাতাল তাই কম লাগবে। পঁচাত্তর হাজার টাকার ব্যবস্থা কর তোমরা।'

'পঁ-চা-ত্ত-র হা-জা-র!' টাকার অঙ্ক শুনে সবার চোখ চড়কগাছ। এত টাকা তারা কোথায় পাবে? বস্তির সবাই তো টোটো চালিয়ে কিংবা দিন মজুরি খেটে দিনে বড় জোর দু'তিনশো টাকা রোজগার করে। একসঙ্গে পঁচাত্তর হাজার টাকা বের করার ক্ষমতা নেই কারও। ওরা সবাই বাড়ি ফিরে এসে বিলুকে বলল, 'তোর মার কঠিন অসুখ হয়েছে বিলু। ডাক্তারবাবু বলেছেন অপারেশন করতে হবে। অনেক টাকা লাগবে। আমাদের কাছে তো অত টাকা নেই।'

'তাহলে কি কাকু?' জিজ্ঞেস করে বিলু।

'ভগবানকে ডাক তিনি যদি এসে কিছু করেন।'

বিলু বলল, 'ভগবানকে আমি কোথায় পাব কাকু?'

ওদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করেই বলল, 'কোথায় পাবি আবার? যা বাজারে গিয়ে কিনে আন গে তোর ভগবান।'

বিলুর বাবা নেই, বাবা থাকলে অনেক আগেই মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেত বাবা আর মার এই অবস্থা হত না। বিলুর মা মালতী কয়েকটা বাড়িতে বাসন মেজে, কাপড় কেচে, ঘরে ঝাড়পোঁছ দিয়ে কোনোমতে মা-ছেলের সংসার চালিয়ে নেয়। বিলুর এখন পাঁচ বছর বয়স, কিন্তু পয়সার অভাবে ওকে স্কুলে দিতে পারেনি ওর মা। ও লেখাপড়া জানে না, অক্ষরজ্ঞান নেই ওর, বোধবুদ্ধিও একটু কম অন্য ছেলেমেয়েদের তুলনায়। ও একটু হাবাগোবা ধরনের। তাই বস্তির ছেলেরা ওর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, ওকে খেপায়। বস্তির কাকুরা চলে গেলে বিলুর মনে হল সব জিনিস যখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তো ভগবানও পাওয়া যাবে বাজারে যেমন বললেন ওই কাকু। কিন্তু ঘরের সব কৌটো খুঁজে বিলু হাতে পেল মাত্র এক টাকা। আর ওই একটা টাকা পকেটে নিয়ে ও পরের দিন সকালে চলে গেল বাজারে। প্রথমেই পড়ল একটা মুদির দোকান। বিলু পকেট থেকে টাকাটা বের করে মুদিকে বলল, 'এই নাও এক টাকা, আমাকে ভগবান দাও। আমার মার বড় অসুখ, ভগবান ছাড়া কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।' মুদি অবাক হয়ে তাকাল বিলুর দিকে, তারপর হাত নেড়ে বলল, 'ইয়ার্কি করছিস আমার সঙ্গে, তাই না? ভাগ এখান থেকে

নইলে পিটিয়ে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব।' বিলু ভয় পেয়ে সরে এল ওখান থেকে। কিন্তু মাকে যে ওকে সারিয়ে তুলতেই হবে, তাই ও সব দোকানে গিয়ে খোঁজ নিল ভগবান কোথায় পাওয়া যায়। কেউ হাসল ওর কথা শুনে, কেউ ওর কান মুলে দিল, আবার কেউ ওর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্রায় পঞ্চাশটা দোকানে তাড়া খেয়ে বিলু যখন কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে আসছিল, তখন রাস্তায় একজন বয়স্ক সাদা চুল দাড়িওলা ভদ্রলোক ওকে বলল, 'কী রে তুই কাঁদছিস কেন?'

বিলু বলল, 'জেঠু আমার মা হাসপাতালে, তাকে সারাতে অনেক টাকা লাগবে। পাড়ার কাকুরা বলেছে ভগবান ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না মাকে। আমি তাই বাজারে গিয়েছিলাম ভগবান কিনতে। কিন্তু কেউ ভগবান তো দিলই না আমাকে, দূর দূর করে সবাই আমাকে খেদিয়ে দিল বাজার থেকে।'

বুড়ো সেই ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'তুই যে ভগবান কিনবি তোর পকেটে টাকা আছে?'

বিলু সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে টাকাটা বের করে দেখাল বুড়ো মানুষটাকে।

সেই মানুষটা বললেন, 'টাকাটা নিয়ে তুই চল আমার সঙ্গে।' বাজার পেরিয়ে গিয়ে বিলুকে বট গাছের নীচে মহাদেবের মন্দিরে নিয়ে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'যা ভিতরে ঢুকে টাকাটা ঠাকুরের সামনে রাখা দানপাত্রে ফেলে দিয়ে ফুল আর বেলপাতা নিয়ে আয় পুরুতের কাছ থেকে। ওর মধ্যে ভগবান থাকেন। ওটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তোর মার মাথায় ঠেকাবি, তবেই তোর মা ভালো হয়ে যাবে।'

বিলু ভিতরে গিয়ে দানপাত্রে টাকাটা ফেলে মন্দিরের পুরুতের কাছ থেকে একটা আকন্দ ফুল আর একটা বেলপাতা নিয়ে এল। সেই বয়স্ক ভদ্রলোক এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর মার নাম কী, কোন হাসপাতালে ভর্তি আছে তোর মা?'

বিলু বলল, 'আমার মার নাম মালতী, তবে সবাই মাকে 'বিলুর মা' বলেই ডাকে। মা পাঁচটা বাড়িতে বাসন মাজে, কাপড় ধোয়। আমার বাবা নেই। ওই তো বাসস্ট্যান্ডের ওপারে যে হাসপাতালটা আছে ওখানেই ভর্তি করা হয়েছে মাকে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে। ফুল বেলপাতা নিয়ে তুই আজ তোর মাকে দিয়ে আয় হাসপাতালে, তারপর দেখ শিবঠাকুর কি করেন।'

সেদিন বিকেলে পাড়ার কাকুদের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে বিলু শুনল ওর মার অপারেশন হয়ে গেছে। কাকুরা অবাক হয়ে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করল বিনা টাকায় কী করে অপারেশন সম্ভব হল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'কেন, আপনারা জানেন না আপনাদের পাড়ার শিবপ্রসাদবাবু এসে সকালেই টাকাটা দিয়ে গেছেন অপারেশনের জন্য। তাই তো সম্ভব হল অপারেশন। উনি এখন ভালো আছে, যান গিয়ে দেখে আসুন আপনারা।'

ওরা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করল কেননা ওদের এলাকায় শিবপ্রসাদ নামে কোনো ভদ্রলোক থাকেন না। ওরা সবাই হাসপাতালের ওয়ার্ডে গিয়ে দেখল বিলুর মা ঘুমোচ্ছে। বিলু গিয়ে মার কপালে সেই মহাদেব মন্দিরের ফুল বেলপাতা ছোঁয়ালে মা চোখ খুলে ওকে দেখে একটু হাসল।

পাড়ার কাকুরা বলল, 'ভগবান তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন মালতী। একজন বড়লোক মানুষ এসে আজ সকালে টাকা দিয়ে গেছেন তোমার অপারেশনের জন্য, তবেই না অপারেশনটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।'

তিনদিন পরে বিলুর মা ঘরে ফিরে এল আর কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজে লেগে গেল। বিলু এখন স্কুলে যেতে শুরু করেছে। স্কুলে যাওয়া আসার পথে ওর চোখ খুঁজে বেড়ায় সেই সাদা দাড়িওলা ভদ্রলোককে যিনি ওকে মহাদেবের মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন আর যিনি হাসপাতালে গিয়ে মায়ের অপারেশনের খরচ দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ও আর সেই ভদ্রলোককে কোনোদিন দেখতে পায়নি।

কিন্নর-ভ্রমণের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

তনুকা ভৌমিক এন্দ

সাড়ে সাত হাজার ফিট উচ্চতায় হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায় 'পিও'র সরকারী রেস্ট-হাউসে বসে আছি আমরা তিন বন্ধু। রাত তখন এগারোটা। সামনে ঠাকুর বলবন্ত সিং দাঁড়িয়ে — হাতে তার আটার রুটি আর ধোঁয়া-ওঠা ডিমের ডালনা। সেই মুহূর্তের আনন্দের আস্বাদন এবং অভিভূত অবস্থার কথা বোঝাতে হলে চোখ ফেরাতে হবে গোটা দিনের ঘটনার দিকে।

সেদিনই ভোরবেলা কিন্নরের জেলা-সদর কল্পায় যাবার জন্য ইনার-লাইন-পারমিটের ব্যবস্থা করে সিমলা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা তিন বন্ধু। ভোর ছটায় বাস ছাড়ল - তাতে গাদাগাদি ভিড়। বোঝা গেল আমরাই একমাত্র ট্যুরিস্ট। কল্পায় কটায় পৌঁছবে বাস? কেউ বলল সন্ধে ছ'টা — কেউ বলল আটটা। ভেবে লাভ নেই, ভাগ্যকে ছেড়ে দিলাম বাস-ড্রাইভার আর প্রকৃতির হাতে। কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে অঝোর বৃষ্টিধারায় স্নান-করা সবুজের জলরং।

সিমলা থেকে ১৩০ কি.মি. দূরে রামপুরে যখন পৌঁছলাম - ততক্ষণে অনেকটা নীচে নেমে এসেছি। পথে না জানি কখন শতদ্রু নদী আমাদের সঙ্গ নিয়েছে, স্থানীয় লোকেরা বলে 'সাটলুজ'।

কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ করলাম যে প্রকৃতির চেহারা পাল্টাতে শুরু করেছে। পাহাড় যেন তার সবুজ মখমলের পরত খসিয়ে পাথরের নগ্নতায় ধরা দিয়েছে আমাদের কাছে। তার গায়ে ইতস্ততঃ ছোট ঝোপ। পাশে শতদ্রু বয়ে চলেছে পাথরে আঘাত করতে করতে। এরপর ওয়াংটু চেক-পোস্টে দেখানো হল পারমিট - আমরা প্রবেশ করলাম 'কিন্নরভূমি'তে। এবারে বাস ক্রমশঃ চড়াইয়ের পথে উঠছে। জানলা দিয়ে দেখছি দুপাশে খাড়া পাথুরে পাহাড়, অনেক নীচে গভীর খাত ধরে বেগে বয়ে চলেছে শতদ্রু। এখানে দু'ধারের পাহাড় খুব কাছাকাছি — মনে হয় নদী যেন পাহাড়ের বুক চিরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। মেটে রঙের জলের স্রোত দুর্বার — সুবিশাল পাথরের উপর ঘা খেয়ে তা স্থানে স্থানে বিপরীতমুখী স্রোতের সৃষ্টি করেছে। এই নদীবক্ষে বিয়াসের মতো নুড়ি-পাথরের প্রাচুর্য নেই, এর কোলে আছে অতিকায় সব পাথরের চাঁই। প্রস্তরের কঙ্কাল বলে যদি কিছু কল্পনা করা যায়, তবে এরা তাই, অবিরত জলের ঘায়ে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সামনে যেখানে শতদ্রু বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়েছে, সেখানে আকাশের গায়ে জেগে উঠেছে তুষারাবৃত হিমালয়। দুপুর দুটো নাগাদ টাপরি নামে একটি ছোট জায়গায় বাস থেমে গেল। সামনে ধস — পথের উপর বিশাল boulder বা পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা ধস পেরিয়ে অন্য বাস ধরবে — দেখাদেখি আমরাও তাদের পিছু নিলাম।

কিন্তু সহযাত্রীরা স্থানীয় হিমাচলী হওয়ার দরুণ তারা শীঘ্রিরই অনেক এগিয়ে গেল। তা-ও চললাম এগিয়ে। ধস পেরিয়ে হেঁটেই চলেছি — সঙ্গী শুধু

পাহাড় আর নদী। অনেকক্ষণ চলার পর আর একটা বাসের দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু আমরা যেতে চাই কল্পা বা নিদেনপক্ষে তার ১৩ কি.মি. আগে পিওতে — এই বাস পিও অবধি যাবে না।

তবে আশ্বাস পেলাম পিও-র বাস আসবে। রইলাম অপেক্ষায়—সঙ্গে আমাদের পুরানো বাসের কন্ডাক্টর আর জনাচারেক যাত্রী। সামনের দোকানে আশ্রয় নিলাম — কারণ বৃষ্টি তখনও সঙ্গেই রয়েছে। এবার আসল আর একটি বাস। দোকানের বাইরে বেরিয়ে পাহাড়ের কোলে চোখ রাখতেই চমকে উঠলাম। বরফে ঢাকা হিমালয়ের চূড়া, তার কোলে রামধনু। বাসে এবার দ্বিতীয় দফা যাত্রা। আর্মির তৈরি সাঁকোতে শতদ্রু পেরিয়ে ছুটে চলেছে বাস... কিন্তু না, আবার থামতে হল তাকে। সামনে ধস। এবার পাথরের চাঁই নয়, ঝুরো মাটির স্তূপ নেমে এসেছে পাহাড়ের মাথা থেকে, সঙ্গে ছোট ছোট পাথরকুচি। একবার পদস্খলন হলে সোজা পৌঁছ যাব শতদ্রুর কোলে। অনেক সাহস করে এই দ্বিতীয় বাধাও পার হয়ে গেলাম।

তারপর কন্ডাক্টর ও চারজন সহযাত্রীর সঙ্গে আবার অপেক্ষায় রইলাম বাসের জন্য। কিন্তু ততক্ষণে চারিদিকে গা-ছমছমে অন্ধকার নেমে আসছে, খাদের মধ্যে বহতা শতদ্রুর মেটে জলের রঙ বদলে হয়েছে লাল, আবার লালের থেকে বদলে কালচে। রাস্তার উল্টোদিকের খাড়া পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে অতিকায় দৈত্যের মতো। অবশেষে দেখা গেল অন্ধকার পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে আসছে একজোড়া উজ্জ্বল হলুদ আলো - আমাদের বাস। কিন্তু প্রকৃতির ধমকে শীগগিরই থামতে হল তাকে। সামনে ধস - পিও অবধি যেতে পারবে না বাস। রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। সহযাত্রীরা সকলেই পায়ে হেঁটে এক ঘন্টার চড়াই পেরিয়ে পিও যাবে - পাহাড়ের গায়ে সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে। অগত্যা আমরাও ওদের পিছু নিলাম।

শীগ্গিরই দম জানান দিতে লাগল। সামনের যাত্রীদের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে চলল ক্রমাগত। কিন্তু খেয়াল করলাম যে জনাচারেক যাত্রী সবসময়েই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। শহুরে অতিথিদের রাতের অন্ধকারে চড়াই উঠতে গিয়ে যাতে বিপদে না পড়তে হয়, সেজন্যই তারা বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো আমাদের আগলে রেখেছিল। যখন অসহ্য ক্লান্তিতে বলে ফেলেছি - 'আর পারছি না' তখন এরাই উৎসাহ জুগিয়েছে, - 'ব্যস, অউর পাঁচ মিনট। সড়ক বিলকুল পাস হ্যায়।' স্তোকবাক্যে ভুলে আবার পা বাড়িয়েছি। অবশেষে সকলে পাহাড়ের মাথায় পাকা রাস্তায় পৌঁছনোর পর নতুন বন্ধুরা আমাদের ঘিরে হৈ চৈ করে একটা ছোটখাট উৎসব করে ফেলল। ওদের কথায় বুঝলাম পিও পৌঁছে গেছি। সেখানে সরকারি রেস্ট-হাউসে রাত্রিবাসেরও সুবন্দোবস্ত হয়ে গেল।

কিন্তু খাব কি? বেলা দুটোর পর থেকে কারোর পেটে দানাপানি পড়েনি। রাত তখন দশটা বেজে গেছে - স্থানীয় দোকান-বাজার সব বন্ধ। রেস্ট-হাউসের ভাঁড়ারও শূন্য।

নতুন বন্ধুদের একজন ঠাকুর বলবন্ত সিং। পেশায় কনস্টেবল এই সুদর্শন যুবক। আমাদের তিনমূর্তির একজন বলবন্ত সিং-এর সঙ্গে বেরিয়ে রাত এগারোটার পরে যখন ফিরল, তখন সঙ্গে গরম চাপাটি ও ধোঁয়া-ওঠা ডিমের ডালনা। দোকান থেকে কেনা নয় - নিজের কোয়ার্টারে বলবন্ত সিং এই রান্না করেছে ও আমাদের বন্ধুকে চা করে খাইয়েছে। আমরা তখন সত্যিই অভিভূত। পরে অনেকবার মনে হয়েছে মানবিকতার এই উষ্ণ নিদর্শন পাওয়াতেই আমাদের কিন্নর-ভ্রমণের সার্থকতা।

পার্কার সোলার প্রোব

(দ্বিতীয় পর্ব)

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে...

অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনার অভিপ্রায়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের চিন্তনে গড়ে তোলেন নানা কল্পিত প্রতিরূপ ও তার প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাকে বাস্তবে পরখ করে সত্যতা যাচাই করতে লাগে বিপুল অর্থ ও আয়োজন এবং সময়। মার্কিন সৌরপদার্থবিজ্ঞানী (Heliophysicist) ইউজিন নিউম্যান পার্কার (Eugene Newman Parker) (১০ই জুন ১৯২৭ - ১৫ই মার্চ ২০২২) সূর্য থেকে উত্থিত অত্যন্ত দ্রুতগামী কণার নির্ঝর ধারাকে সৌরবাত্যা বলেছেন। প্লাজমা, সৌর-চৌম্বকক্ষেত্র ও শক্তিশালী কণার সম্মিলিত এক সম্পূর্ণ জটিল তন্ত্রের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি এই পরিঘটনার (Phenomenon) সঙ্গত যুক্তিতে বর্ণনা করেছেন। বিজ্ঞানী পার্কার সূর্যের মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত ছটামণ্ডলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন যা তৎকালীন পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বিপরীত। সৌরপৃষ্ঠ থেকে বহুদূরে থাকা ছটামণ্ডলের তাপমাত্রা এত বেশি কেন? সূর্যের পৃষ্ঠতলের চেয়েও অনেকগুণ বেশি তাপমাত্রার ছটামণ্ডলের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রবাহ কিভাবে হচ্ছে? এই সব প্রশ্নের সদুত্তর মানবজাতির জানা ছিল না। তাঁর প্রণীত তত্ত্ব অনুসারে নিয়মিত ঘটতে থাকা ছোট ছোট সৌর বিস্ফোরণগুলি এমন অতিতপ্ত ছটামণ্ডলের প্রধান কারণ, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে ন্যানো ঝলক (nanoflare) বলে। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, পার্কার সোলার প্রোব দিয়ে মূল পর্যবেক্ষণ এখন পার্কারের যুগান্তকারী তত্ত্ব এবং ধারণাগুলির সত্যতা প্রমাণ করেছে, যা সৌর পদার্থবিদ্যা (Heliophysics) এবং নক্ষত্রের চারপাশে চৌম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে নব প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের অবহিত করেছে। ২০১৮ সালের ১২ই অগাস্ট মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ইউজিন পার্কার-এর সম্মানে নামাঙ্কিত পার্কার সোলার প্রোব মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে। তিনি জীবদ্দশাতেই এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখে বলেন, 'এই মহাকাশযানকে তার নামে নামাঙ্কিত করে তার কাজের প্রতি যে সম্মান দেওয়া হল, সেটা তাঁর কর্মজীবনে সবচেয়ে গর্ব করার মতো অন্যতম কৃতিত্ব।' পার্কার সোলার প্রোব প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল —

১) সূর্যের ছটামণ্ডল উত্তপ্ত করার ও সৌরবাত্যাকে ত্বরান্বিত করার জন্য শক্তি প্রবাহের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা।

২) সৌরবাত্যার উৎসে প্লাজমা ও চৌম্বকক্ষেত্রের গঠন ও গতিশীলতা নির্ধারণ করা।

৩) সৌরবাত্যার দ্রুতগতিতে ধাবমান কণাগুলো কিভাবে ত্বরান্বিত হয়ে শক্তি পরিবহন করে তার প্রক্রিয়া অন্বেষণ করা।

সূর্যের খুব কাছে যাওয়ার ফলে পার্কার সোলার প্রোব-এর অতি সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি উচ্চ তাপমাত্রায় যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে ইঞ্জিনিয়ারদের একটি বিশেষ তাপ প্রতিরোধক পাঁচস্তর বিশিষ্ট ঢাল তৈরি করতে হয়েছিল। একেবারে বাইরের স্তরটি সাদা সেরামিক (ceramic) দিয়ে তৈরি, সূর্যের সমস্ত রশ্মিকে প্রতিফলিত করে। সেরামিক হল এক ধরণের তাপরোধক

ও ক্ষয়রোধক পদার্থ। দ্বিতীয় স্তরটি তাপরোধক স্তর যা প্রথম ও তৃতীয় স্তরকে সংযুক্ত করে। ১১.৪ সেমি পুরু তৃতীয় স্তরটি খুব হালকা ও মজবুত যা কার্বন-কার্বন কম্পোজিট (carbon-carbon composite) দিয়ে তৈরি। চতুর্থ স্তরটি কার্বন ফোম (carbon foam) দিয়ে তৈরি যা তাপ পরিবহন করে না বললেই চলে। পঞ্চম স্তরটি আবার কার্বন-কার্বন কম্পোজিট দিয়ে তৈরি যা সম্পূর্ণ ঢালকে যথেষ্ট মজবুত করে তোলে। বিশেষভাবে নির্মিত সম্পূর্ণ ঢালটির ভর মাত্র ৭৩ কিগ্রা। সম্পূর্ণ ঢালটির একদিকে তাপমাত্রা -৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস যেখানে যাবতীয় পর্যবেক্ষণের যন্ত্র রাখা হয়েছে কিন্তু অপরপ্রান্তে তাপমাত্রা প্রায় ১৪০° ডিগ্রী সেলসিয়াস। পার্কার সোলার প্রোব সৌর-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সূর্যের বাইরের বায়ুমন্ডলে সরাসরি পরিমাপ করে তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে যা ছটামণ্ডল ও সৌরবাত্যা নামে পরিচিত। মহাকাশযানটি উৎসের কাছাকাছি পৌঁছে সৌরবাত্যার গতিবেগ, ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার বিবরণ সরবরাহ করেছে।

সূর্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারী যানটি বিজ্ঞানীদের সৌরঝলক এবং ছটামন্ডলীয় সৌরপদার্থের প্লাজমা উদ্‌গীরণ (coronal mass ejection) সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সুযোগ এনে দিয়েছে যা, প্রকৃতপক্ষে সূর্য থেকে শক্তি এবং কণার প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরণ। এই ঘটনাবলী ও আমাদের পৃথিবীতে তাদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে আমাদের আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে।

এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা। পূর্ববর্তী যে-কোনও মহাকাশযানের চেয়ে সূর্যের কাছাকাছি যাওয়ার মাধ্যমে পার্কার সোলার প্রোব সৌর চৌম্বকক্ষেত্রের গঠনের উপর মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছে। সৌরপদার্থবিজ্ঞানে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

এই অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল কেন সূর্যের ছটামণ্ডল তার পৃষ্ঠতলের চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ তার প্রকৃত কারণ জানা।

পার্কার সোলার প্রোব উচ্চশক্তির সৌরপদার্থের কণার উৎস এবং কণার ত্বরান্বিত হওয়ার প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে জেনেছে, যা সৌর বিস্ফোরণের সময় মহাশূন্যে মুক্তিপ্রাপ্ত উচ্চশক্তির কণা। এই কণা সম্পর্কে অধ্যয়ন করে বিজ্ঞানীরা সূর্যের বায়ুমণ্ডলে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে এক অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন। পার্কার সোলার প্রোব সূর্যপৃষ্ঠ থেকে সর্বনিম্ন দূরত্বে (৬১ লক্ষ ২৮ হাজার কিমি) পৌঁছালে যন্ত্রটির বহিরাবরণের তাপমাত্রা বেড়ে প্রায় ১৪০° ডিগ্রী সেলসিয়াস হলেও ভিতরের যন্ত্রপাতি সাধারণ ঘরের তাপমাত্রায় থাকে। এই পরিস্থিতিতে মহাকাশযানটির সর্বোচ্চ গতিবেগ দাঁড়ায় ঘন্টায় প্রায় ৬ লক্ষ ৯২ হাজার কিমি। ইতিপূর্বে আর কোনও মহাকাশযান এত দ্রুতগতিতে যায়নি, সূর্যের এত কাছে পৌঁছায়ননি এবং এত বিপুল পরিমাণ তাপ ও শক্তিশালী বিকিরণের সম্মুখীন হয়নি।

২০২৩ সালের ১৭ই মার্চ পার্কার সোলার প্রোব পঞ্চদশতম বার সূর্যের সবচেয়ে সন্নিকটে এসে নানা তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করে। সূর্যের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর সৌরবাত্যায় এমন কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গেছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি, এগুলির সমস্ত চিহ্ন পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগেই মুছে যায়। ফলে পৃথিবী পরিক্রমারত সূর্য-পর্যবেক্ষণাগার থেকে এসব জানার উপায় নেই। অর্থাৎ সূর্যের নিকটে যন্ত্র পাঠিয়ে যা জানা গেছে তা পৃথিবীর দূরত্বে থেকে জানার সম্ভাবনা নেই। পার্কার সোলার প্রোবের কক্ষপথের বিবরণ (চিত্র-২.১)-তে দেওয়া হল।

পার্কার সোলার প্রোব থেকে পাওয়া সর্বপ্রথম তথ্য বিশ্লেষণের পর বোঝা যায় যে সৌর-চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ সূর্য থেকে মহাশূন্যের দিকে হলেও হঠাৎ আবার সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমুখী হয়ে পুনরায় সৌরপৃষ্ঠে পৌঁছায় সৌরবাত্যার কণাগুলি আসলে সৌর-চৌম্বকক্ষেত্র বয়ে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সৌর-প্লাজমার সূর্য থেকে উপর ওঠার পর নীচে নামা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সূর্যপৃষ্ঠ থেকে উৎপন্ন সৌর-চৌম্বকক্ষেত্র পুনরায় সরাসরি সূর্যপৃষ্ঠেই ফিরে আসে। বুধগ্রহের কক্ষপথের অভ্যন্তরে সৌর-চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ পরিবর্তন (flips) (যেমন সূর্য থেকে বাইরের দিকে এবং যখন তখন পুনরায় সূর্যের দিকে হওয়া) যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা (চিত্র-২.২)। এমন অভিমুখ পরিবর্তনের স্থায়িত্বকাল কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট অবধি হয়। বুধগ্রহের কক্ষপথের বাইরে এমনটি

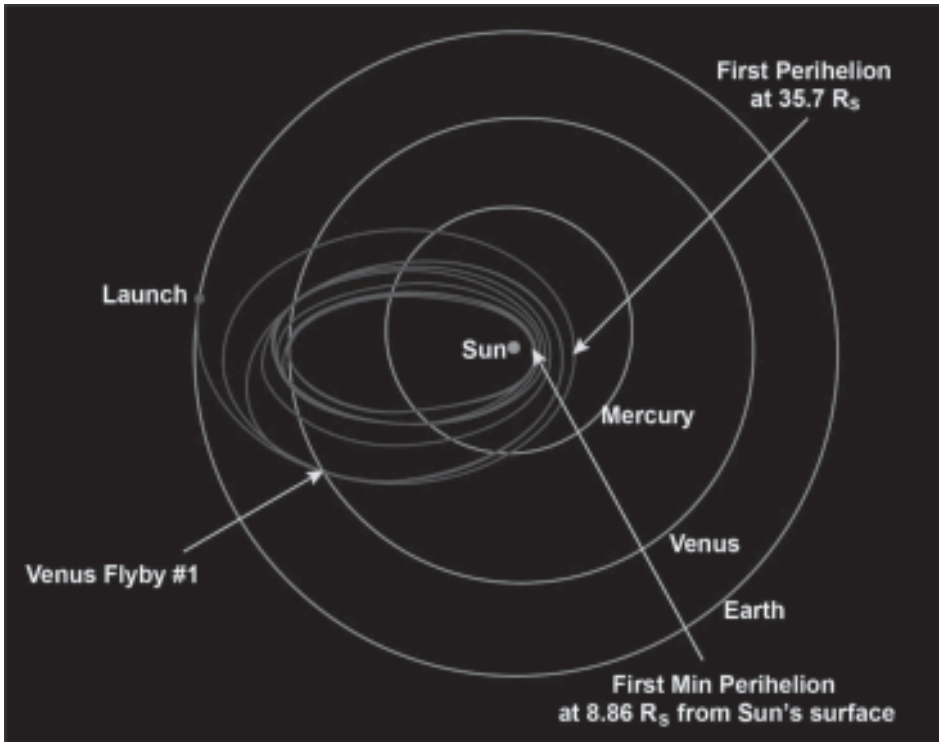

চিত্র ২.১ ঃ পার্কার সোলার প্রোবের কক্ষপথের বিবরণ।

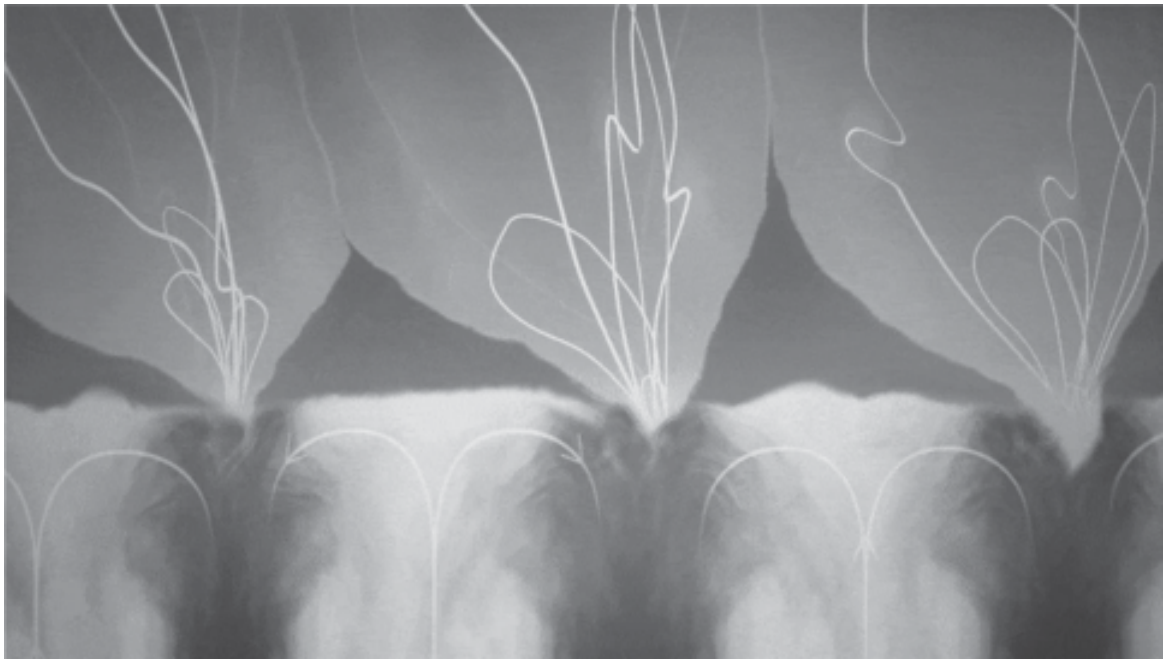

চিত্র ২.২ ঃ বুধগ্রহের কক্ষপথের অভ্যন্তরে সৌর-চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ পরিবর্তন (flips) (যেমন সূর্য থেকে বাইরের দিকে এবং যখন তখন পুনরায় সূর্যের দিকে হওয়া) যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

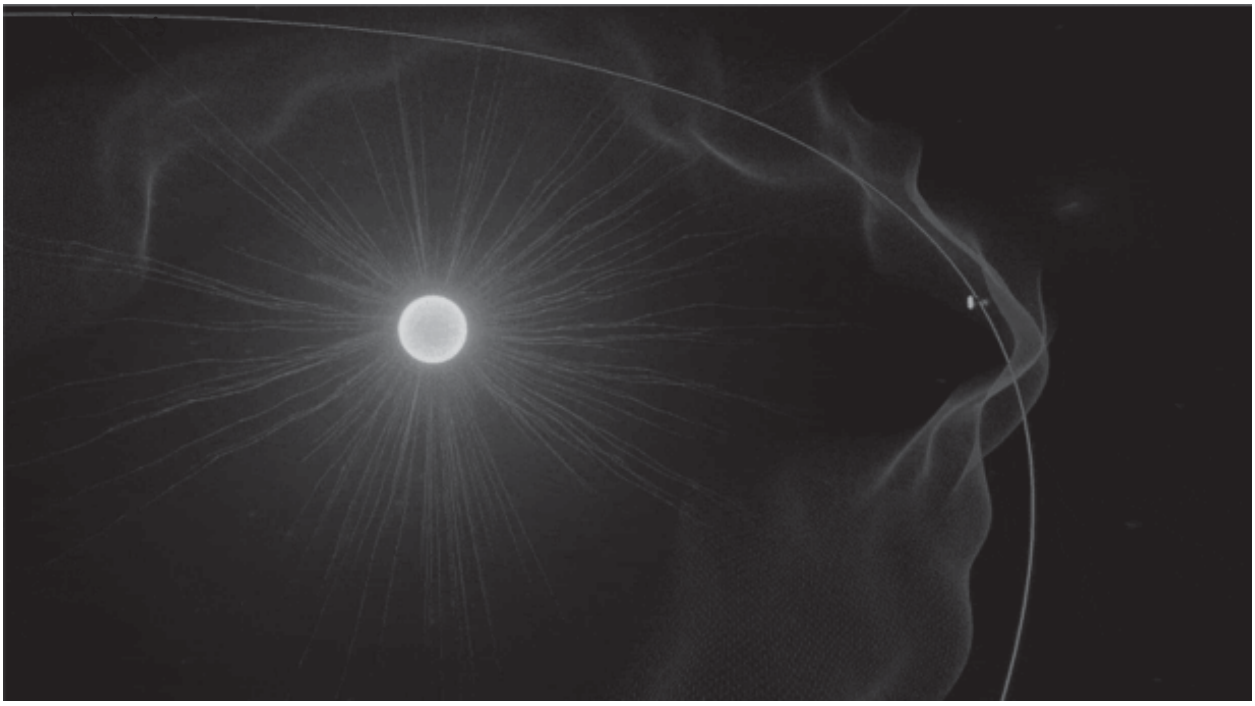

চিত্র ২.৩ ঃ সূর্যের বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই এমন এক কল্পিত পৃষ্ঠতল বা সীমানা রয়েছে যার নাম হল আলফভেন নির্ধারক তল (Alfven citical sufrace) যার অভ্যন্তর থেকে বাইরের দিকে অতিক্রম করা মাত্রই উৎক্ষিপ্ত সৌরপদার্থসমূহ দ্রুতবেগে মহাশূন্যে পাড়ি জমায়।

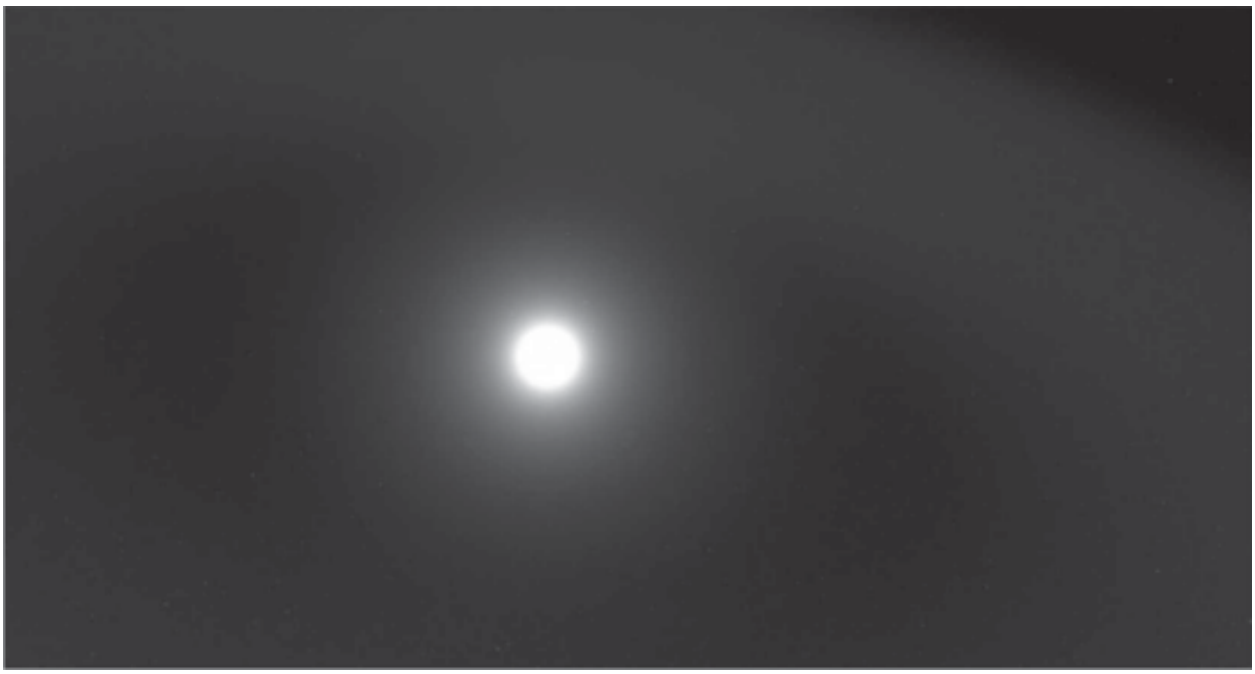

চিত্র ২.৪ ঃ আমাদের সৌরজগৎ জুড়ে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণা (cosmic dust)

হয় না বলে মনে করা হয়। যদিও পার্কার সোলার প্রোব-এর মতো আরও মহাকাশযান না পাঠানো পর্যন্ত এটি হলফ করে বলা সম্ভব নয়।

সূর্যের বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই এমন এক কল্পিত পৃষ্ঠতল বা সীমানা রয়েছে যার নাম হল আলফভেন নির্ধারক তল (Alfven critical surface) (চিত্র ২.৩), যার অভ্যন্তর থেকে বাইরের দিকে অতিক্রম করা মাত্রই উৎক্ষিপ্ত সৌরপদার্থসমূহ দ্রুতবেগে মহাশূন্যে পাড়ি জমায়। ছটামণ্ডল ও সৌরবাত্যার অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমান্ত হল আলফভেন নির্ধারক তল। এই সীমানাতেই ছটামণ্ডলীয় প্লাজমা ও সৌরবাত্যার কণাদের সমান গতিবেগ পরিলক্ষিত হয়। সৌর বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত আলফভেন নির্ধারত তলে মহাকাশযানটি একাধিকবার প্রবেশ ও বাহির হয়ে অবশেষে নিরাপদে বেরিয়ে আসে।

সৌরপদার্থ বা প্লাজমার উপাদান সেই সীমানা অতিক্রম করতে পারলেই সৌরবাত্যায় পরিণত হয়, যা আসলে দ্রুত ধাবমান ইলেকট্রন, প্রোটন ও অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলের এক বা একাধিক আধানে আয়নিত পরমাণুকেন্দ্রক। সৌরবাত্যা মূলত একাধিক স্বতন্ত্র ফিনকির (jet) মতো কয়েকশ থেকে হাজার কিমি দীর্ঘ প্রবাহ যা ছটামণ্ডলের নীচের অঞ্চল থেকে মাঝে মাঝে বিস্ফোরিত হয়ে বের হয়। আলফভেন নির্ধারক তল কেমন দেখতে? মোটেও গোলকের মসৃণ তলের মতো নয়, এতে রয়েছে অসংখ্য বড় পেরেক বা গজালের মতো স্পাইক ও গভীর উপত্যকা। যার ফলে এই তলটি বড়ই কুঞ্চিত বা কোঁচকানো। সৌরবাত্যায় সৌর চৌম্বকক্ষেত্রের আঁকাবাঁকা সর্পিল গঠন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী সূর্য পর্যবেক্ষণাগার থেকে এ বিষয়ে সামান্য জানা গেলেও এর আগে এ বিষয়টি কখনও সরাসরি পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। আলফভেন নির্ধারক তল অতিক্রমণের পর শক্তিশালী সৌরবাত্যার প্রবাহ সৌরজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সূর্য থেকে প্রায় ৮০-১০০ এ.ইউ দূরত্বেও সৌরবাত্যার অস্তিত্ব সনাক্ত করা হয়েছে। এ.ইউ হল সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ গড়ে প্রায় ১৫ কোটি কিমি।

প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞানে ও সৌর পদার্থবিজ্ঞানে আলফভেন নির্ধারক তল এক প্রাথমিক সীমানা যা সূর্যের মতো নক্ষত্রকে সবদিকে ঘিরে রেখেছে, যেখানে বহির্গত প্লাজমার গতি (V_{SW}) (সৌরবাত্যার বেগ) আলফভেন গতির (V_A) সমান হয়ে যায় ঃ

$V_{SW} = V_A$

$V_A = B / \sqrt{(\mu o \rho)}$ যেখানে ρ = প্লাজমার ঘনত্ব μo = শূন্য মাধ্যমের চৌম্বক ভেদ্যতা (permeability) এবং B = চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রাবল্য (magnetic flux density/ field strength)

সূর্য ও আলফভেন নির্ধারক তলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সৌরবাত্যার বেগ চৌম্বকীয় ব্যাঘাত (magnetic disturbance) বা আলফভেন তরঙ্গের চেয়ে কম থাকে। অর্থাৎ চৌম্বকীয় ব্যাঘাতজনিত তরঙ্গ সূর্যের দিকেও ধেয়ে যায়। তার মানে হল প্লাজমাকে সূর্য নিজস্ব চৌম্বক বলরেখা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে।

আলফভেন নির্ধারক তলে সৌরবাত্যার গতি ও চৌম্বকীয় ব্যাঘাত তরঙ্গের গতি একেবারে সমান।

আলফভেন নির্ধারক তল অতিক্রম করা মাত্রই সৌরবাত্যার গতি ব্যাঘাত তরঙ্গের গতির চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। কারণ এই অঞ্চলে চৌম্বকীয় ব্যাঘাত তরঙ্গ পুনরায় সূর্যের দিকে ফিরে যেতে পারে না, ফলে আরও সহজ করে বললে, সৌরবাত্যা এবং সূর্যের মধ্যে কার্যকারণ যোগাযোগটাই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সূর্য এই সীমানার বাইরে প্লাজমার গতির উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

আমাদের সৌরজগৎ জুড়ে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণা (cosmic dust) (চিত্র - ২.৪)। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে সূর্যের কাছাকাছি রয়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণা-মুক্ত অঞ্চল। ধূলিকণা থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক পর্যবেক্ষণ করে পার্কার সোলার প্রোব জানিয়েছে - সূর্যপৃষ্ঠ থেকে ৫৬ লক্ষ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত অঞ্চল প্রায় মহাজাগতিক ধূলিকণাহীন। সূর্যের নিকটাঞ্চলে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিকিরণের ফলে মহাজাগতিক ধূলিকণা বাষ্পে পরিণত হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

অতুলনীয় টার্কি

তৃতীয় পর্ব

দেবদত্ত

আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতে গঠিত, বহুবছরের বায়ুপ্রবাহ ও অন্যান্য ভৌগলিক কারণে যে শিল্পসুষমামন্ডিত অসাধারণ ডিজাইন তৈরি করেছে, তার আকর্ষণে দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরা এখানে ভীড় জমান। অনেক ট্যুরিস্ট ভোরে উঠে বেলুন রাইডে যায়। আমরা করিনি। ভোরের সূর্যোদয়ের সাথে ক্যাপাডোকিয়ার ল্যান্ডস্কেপ নাকি 'once in a life time' এক্সপিরিয়েন্স। পারহেড ৩২৫ ডলার, অনেকটাই বেশি মনে হল। তবে সবাই বলে বেলুন রাইড না করাটা বিশাল মিস। এ যাত্রায় বেলুন রাইডকে 'আঙুরফল টক' ধরে নিয়ে মনকে শান্ত করি!

সকাল সকাল বেরিয়ে আমরা চল্লিশ কিমি দূরে, পৌঁছালাম ডেরেনকিউ আন্ডার গ্রাউন্ড সিটি। রাস্তায় ক্যাপাডোকিয়ার ইউনিক ল্যান্ডস্কেপ চোখে পড়ল। ক্যাপাডোকিয়াতে প্রায় ২০০ আন্ডারগ্রাউন্ড সিটি আছে। তবে এর মধ্যে বড় ও দেখার মতো দুটো সিটি - একটা ডেরেনকিউ আর অন্যটা Kaymakli। অনেকেরই বাড়ি এক্সটেনশন করতে গিয়ে হঠাৎ করে ক্লাস্টার অফ কেভসের সন্ধান পেয়েছে। ডেরেনকিউতে এরকমই ব্যাপার ঘটেছিল। স্থানীয় একটি লোকের মুরগী প্রায়ই হারিয়ে যেত, অনেকদিন পর সেই লোক এই গুহার সন্ধান পায়। টিকিট কেটে ঢোকার আগে কাঁচের মধ্যে একটা মডেল রাখা ছিল। জেম আলি জানাল সবচেয়ে উপরের তলায় রাখা থাকত গবাদি পশু, দ্বিতীয় লেভেলে রাখা হত খাদ্যশস্য, তৃতীয় লেভেলে থাকত গুহাবাসীরা আর সবচেয়ে নীচের লেভেলে কমিউনিটি কিচেন ছিল। মনে করা হয় এখানে একসময়ে ২০,০০০ লোক থাকত। আন্ডারগ্রাউন্ড সিটিতে ঢোকার আগে জেম আলি সতর্ক করে দিল কারুর যদি ক্লস্ট্রোফোবিয়া থাকে বা ঠিকমতো ফিটনেস না থাকে তবে না নামাই ভালো, কারণ খুব সরু সারপেন্টাইন গলি দিয়ে এক গুহা থেকে অন্যটাতে যেতে হবে। সবাই খুব এক্সাইটেড, কারণ এরকম মাটির ভিতরে শহর কেউ আগে দেখেনি।

গুহাগুলির ভিতর আলোর সুবন্দোবস্ত আছে। প্রথম লেভেলে জেম আলি দেখাল গুহার মধ্যে নীচে আংটার মতো গর্ত করা যাতে গবাদি পশু বেঁধে রাখা যায়। এরকম আন্ডারগ্রাউন্ড সিটি প্রথম বানিয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব সাতশ/আটশ বছর আগে, বানিয়েছিল ফিগ্রিয়ানরা (Phigryian)। ফিগ্রিয়ানদের পর আসে বাইজানটাইনরা। এদের সময় সবচেয়ে বেশি ভূগর্ভস্থ শহর তৈরি হয়। পরে খ্রীস্টানরা এখানে থাকা শুরু করে। খ্রীস্টাব্দ ৭০০ সাল অবধি লোকেরা এখানে থাকত। সরু গলির মধ্যে পাকদণ্ডী দিয়ে সিঁড়ি নেমেছে নীচে। কোথাও হাঁটু মুড়ে চলতে হচ্ছে। বেশ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। ভলকানিক ইরাপশনে উপরের ক্রাস্টটা ব্যাসাল্ট হয়ে শক্ত থাকে, নীচে থাকে সফ্‌ট রক। অনুমান করা হয়, বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পেতে ও অত্যাধিক শীত এড়াতে, অধিবাসীরা খনন কার্য করে গুহা বানায় ও ধীরে ধীরে গুহায় সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ছোটখাট শহরের রূপ নেয়। তৃতীয় তলায় যেখানে কিচেন, তার ছাদগুলো সব কালো হয়ে আছে। ধোঁয়া বেরানোর একটা প্যাসেজও আছে। গম বা জোয়ার পেষার চাক্কিও দেখা গেল। এক ঘন্টা পুরো লাগল ভিতরটা ঘুরে দেখতে। বেরিয়ে এসেছি ধরণীর বহির্ভাগে, তবে যা দেখে এলাম তা মনের মণিকোঠায় চির অমলিন থাকবে।

ওখান থেকে আমরা এবারে ফিরে এলাম মূল ক্যাপাডোকিয়া শহরের কাছে পাসাবাগ (Pasabag) দেখতে। ইংরেজিতে এর নাম Valley of Monks. তুর্কী ভাষায় পাসাবাগ মানে হল ভাইনইয়ার্ড। এই জায়গায় একসময় বাইজানটাইন গ্রীকেদের বসতি ছিল। এই ওপেন এয়ার মিউজিয়ামে প্রকৃতির আপন খেয়ালে ন্যাচারাল ওয়েতে তৈরি ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য 'ফেয়ারি টেল চিমনি' আছে। ফটোগ্রাফির স্বর্গরাজ্য। এখানে ঢুকতে টিকিট লাগে। লম্বা চিমনির উপরিভাগটা কালো রং-এর। উপরটা শক্ত ব্যাসাল্ট রক। নীচের

ভাগটা অপেক্ষাকৃত সফ্‌ট রক। কয়েকটা চিমনিতে কিছুটা উপরে ওঠা যায়। তার মধ্যে আবার ছোট গুহা। গুহার খোলা জানালা দিয়ে দূরের চিমনির ফটো নিলাম। অনেক ট্যুরিস্ট এসেছে। এপ্রিল, মে মাস হল ট্যুরিজমের পিক সিজন। এই মুহূর্তে টার্কি দেশ হিসাবে তৃতীয় স্থানে আছে বিদেশী পর্যটক আসার ক্ষেত্রে। এই বছর পাঁচ কোটি লোক টার্কি বেড়াতে এসেছে। পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে টার্কি পর্যটনভিত্তিক ব্যবসা থেকে।

পাসাবাগ থেকে কাছেই হল বিখ্যাত গুরেম (Goreme Open Air Museum) ভ্যালি। বাস থেকে নেমে যাওয়ার রাস্তায় সারি সারি দোকান। বেশ কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পর দুইদিকে দুটো সিঁড়ির রাস্তা। ডানদিকের রাস্তাটা অনেকদূর অবধি চলে গিয়েছে। চারিদিকে বেশ কিছু ফেয়ারি চিমনি। বামদিকে কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠলে পাহাড়ের গায়ে চার্চ দেখা যাচ্ছে। গ্রুপের বাকীরা ডানদিকে চলে গেল। আমরা দুইজন সিঁড়ি ভেঙে চার্চে পৌঁছালাম। এখানে পাহাড়ের গায়ে খোপকাটা। দূর থেকে দেখলে জানালা মনে হয়। এই গুরেম ভ্যালির পাহাড়গুলিতে বাইজানটাইন সময় থেকে খ্রীস্টান মঙ্ক ও নান-রা সমষ্টিগত ভাবে থাকত। পাথর কেটে কেটে চার্চ/চ্যাপেল বানিয়েছিল। আমরা যে পাহাড় কেটে বানানো চার্চে ঢুকলাম, এটাই সবচেয়ে বড়, নাম হল বাকল (Buckle) চার্চ। খ্রীস্টাব্দ ৮০০ এডিতে তৈরি হয়েছিল। এটাই এই অঞ্চলের প্রথম চার্চ। ভিতরটা বেশ বড়। রেস্টোরেশনের কাজ চলছে। দেওয়াল ও ছাদে নানা ধরনের খ্রীস্টের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের নানা কাজ সম্বন্ধিত পেন্টিং। উজ্জ্বল নীল কালার চোখে পড়ল।

এরপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে, আমি একাই ডানদিকের সিঁড়ি ভেঙে রাস্তা ধরলাম। দলের বাকিরা অনেক আগেই এই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। চড়াই রাস্তার শেষে টিকিট কাউন্টার ও গেট। গাইডের কাছে আমার টিকিট থাকার কথা। কিন্তু টার্কিতে সিম নিইনি, তাই ফোন করার সুযোগ নেই। কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। জেম আলির নম্বর ছিল আমার কাছে। চট করে মাথায় আইডিয়া এল। গেটের সিকিউরিটিকে বুঝিয়ে বললাম জেমকে ফোন করতে। একটু পরে জেম এসে টিকিট

ফেয়ারিটেল চিমনি

স্ক্যান করিয়ে আমায় ভিতের নিয়ে গেল। সামনেই বামদিকে এক তিনকোণা পাহাড়। এগুলো সবই সলিড রক। তাই কোথাও সবুজের আভাস নেই। জেম বলল এটা ছিল নানেদের থাকার জন্য। আরেকটু এগিয়ে বর্তুলাকারে রাস্তা, পরিধির পাশে পাশে রকের মধ্যে চার্চ ও থাকার গুহা। প্রথমে যে চার্চটা দেখে এলাম, তার প্রায় ১০০ বছরের মধ্যে বাকি চার্চ তৈরি হয়। জায়গাটার ল্যান্ডস্কেপ এমন অতিপ্রাকৃত ধরনের যে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মস্থান হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, পরের দিকে গোরেমে হয়ে ওঠে পিলগ্রিমেজ প্লেস। চার-পাঁচটা চার্চ আছে দেখার মতো। সবই তৈরি হয়েছে হাজার বছর আগে। একটা চার্চের নাম এপেল চার্চ, আরেকটার নাম স্নেক চার্চ। প্যাসেজ দিয়ে কিছুটা ঢুকে, দুইদিকে চওড়া হয়ে গিয়েছে। ছাদটা ব্যারেলশেপের। চ্যাপেলের ভিতরে ঐ সময়ে আঁকা যীশুর কর্মকান্ড নিয়ে পেন্টিং। রোমানদের সময় গোরেমে ব্যবহৃত হত কবরখানা হিসাবে। একটা চার্চে ঢোকার দুইপাশে দুটো কঙ্কাল রাখা আছে, গ্লাস কভারের মধ্যে। একটা গুহার ভিতর ভাঁড়ার ঘর, কমিউনিটি কিচেন দেখা গেল।

খ্রীস্টাব্দ ১১০০ শতক নাগাদ এনাতোলিয়া দখল করে সেলজুক ডাইনাস্টি। এরা ছিল মুসলিম। তখন খ্রিস্টানরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যায়। ১৯০০ সাল নাগাদ এখানের চার্চে আসত গ্রীক অরিজিন খ্রিস্টানরা। ১৯২৪ সালে সব গ্রীক চলে যায় গ্রীসে, পরিবর্তে গ্রীস থেকে মুসলিমরা আসে টার্কিতে। তারপর থেকে গোরেমে এবানডনড হয়ে পড়েছিল। বছর পঞ্চাশ আগে তুরস্কের সরকার এই অঞ্চলের ট্যুরিসিম পোটেনশিয়াল

গুরেম ভ্যালি

বুঝতে পেরে, সমস্ত রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করে। একটা চার্চে ঢুকতে পারিনি। তার নাম স্নেক চার্চ। এর জন্য আলাদা টিকিট কাটতে হয়। এটার নাম ডার্ক চার্চ। এর ওয়াল পেন্টিং সবচেয়ে ওয়েলপ্রিসার্ভড। লোকাল লোকেরা এখানে পিজিয়ন বিষ্টার কালচার করত, যার জন্য পেন্টিং সব ঠিকঠাক আছে। ক্যাপাডোকিয়াতে একটা পিজিয়ন ভ্যালি আছে, যার পাহাড়ের খোপে খোপে অসংখ্য পায়রা থাকত। লোকাল চাষীরা এই বিষ্ঠা সার হিসাবে ব্যবহার করত। ওরা বলে ওই কারণে এখানের ফল সবচেয়ে মিষ্টি।

ফেরার রাস্তায় আমরা নামলাম এক জুয়েলারির শপে। ইন্ডিয়ানরা জুয়েলারি কেনাতে কার্পণ্য করে না। সবাই কিছু না কিছু কিনছে। টার্কিশ লোকাল স্টোন 'সুলতানেট' খুব বিখ্যাত। এটার রঙ বদলায়, বিভিন্ন আলোর সামনে ধরলে। সুমিতা একটা আংটি কিনল। পাঁচটা নাগাদ হোটেলে ফিরে দেখি তখনো সন্ধ্যে হয়নি। একাই বেরোলাম কাছাকাছি ঘুরে ফিরে দেখতে। আমাদের হোটেলের নাম রামাদা। বেশ বড় লাক্সারি হোটেল। হোটেলের পাশের রাস্তা দিয়ে যেয়ে গিয়ে দেখি, হোটেলের তলায়ও রককাট গুহা। ক্যাপাদোকিয়াতে যেখানেই যাও না কেন কিছু না কিছু প্রাকৃতিক কর্মকান্ড দেখা যাবে। গতকালের দেখা কলোনির পাশ দিয়ে গিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত বড়রাস্তায় পড়লাম। দূরে উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। একটা হোটেল দেখলাম গুহার মধ্যে তৈরি। জেম আলি আসার সময় বলছিল, অনেক লোকাল, ক্যাপাডোকিয়াতে গুহার মধ্যে বুটিক হোটেল বানিয়েছে। পিক সিজনে খুব চড়া দাম, কারণ অনেকেই এরকম গুহার মধ্যে হোটেলে থাকার ফিল নিতে চায়। জেম আলির বাড়ি ক্যাপাডোকিয়ার কাছে। ওর মা নাকি বলে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে যারা কেভের ভিতর বাসস্থান করে থাকত, তাদের গরীব ধরা হত। এখন হোটেল খুলে তারা টু-পাইস কামাচ্ছে। হোটেলে ফিরে, সুইমিং, সওনা, স্টিমবাথ সবই ঢুঁ মারলাম। টেম্পারেচার কনট্রোলড পুল। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। মনে ছিল এই সময় বেলুন রাইড হয়। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি দূর আকাশে কয়েকটা বেলুন দেখা যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

জীবন অপরাহ্নে

বিপ্লব দাশগুপ্ত

জীবনের গতি কোনো নির্দিষ্ট পথে চলে না। বিভিন্ন বাঁকে তার গতি হয় ভিন্ন। এটাই জীবনের একটা বৈচিত্র্য। সেই পটভূমিকাতেই এই কাহিনী, 'জীবন অপরাহ্নে'।

অনিরুদ্ধ একজন বাচিক শিল্পী হিসেবে, মনোরঞ্জন জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তার গলার স্বর, বাচনভঙ্গী কলেজ জীবন থেকেই অনিরুদ্ধকে জনপ্রিয় করেছে। ধীরে ধীরে তার নাটকের প্রতি স্পৃহা তাকে অভিনয় জগতেও নিয়ে এসেছিল। নাট্যকার হিসেবেও অনিরুদ্ধ অনেক নাটক লিখছে, অভিনয় করছে, এমনকি পরিচালকের দায়িত্ব ও পালন করছে। দীর্ঘ বিশ বছরের উপর সে মনোরঞ্জন জগতের সাথে যুক্ত। বেশ সুঠাম চেহারা অনিরুদ্ধর, নায়কোচিত। সোনালি ফ্রেমের চশমাটা তার ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। কলকাতার পাটুলিতে বিরাট বাড়ি। ওর বাবাই মনের মতো করে বাড়িটা বানিয়েছিলেন। তিনি পেশায় Software Engineer ছিলেন। এক আমেরিকান কোম্পানির সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সস্ত্রীক আমেরিকায় নিজের কর্মজগত বানিয়ে সেখানেই immegrate করে যান। অনিরুদ্ধ কলকাতাতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। সেইজন্য ভারতেই থেকে যেতে হয়। এখন পাটুলির বাড়ির একমাত্র অধিপতি। নিজের কর্মজগত নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে নিজের পরিবার বানানোর ভাবনাই মনে স্থান দিতে পারেনি। বাড়িতে নাটকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে, তাতেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে তার সংসার।

অনিরুদ্ধর জীবনে যৌবন এখন বিগত, কিন্তু স্বভাবটা এখনও নায়কোচিত। বাড়ির খবরদারি করে কালুদা। অনেকদিন ধরেই এই বাড়ির সাথে জড়িত। অনিরুদ্ধর ছোটবেলা থেকেই এই বাড়িতে আছে। আজও অনিরুদ্ধর সঙ্গ ছাড়তে পারেনি। একটা জিনিসের উপরই অনিরুদ্ধর মোহ আছে, সেটা হল ওর পোষাক। মাড় দেওয়া ধবধবে পাজামা আর সাদা মসৃণ খদ্দরের পাঞ্জাবি।

অনিরুদ্ধর লেখা 'জীবন যখন যে রকম' নাটকটি বাজারে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। নতুন একটা নাটক লিখছে। অনিরুদ্ধ দোতলার বারান্দায় বসে নাটকের চরিত্রায়ণ করতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ নীচে দরজায় বেল বেজে উঠল। কালুদা নীচে চলে গেছে। কালুদা কিছু খবর দেবার আগেই ওর সামনে এসে দাঁড়াল এক ভদ্রমহিলা। বেশ সুন্দর দেখতে, পরিপাটি করে সেজে এসেছে। মধ্যবয়সী, যৌবন প্রায় উত্তীর্ণ, কিন্তু সুন্দরভাবে ভদ্রমহিলার শরীরে এখনও বিদ্যমান।

অনিরুদ্ধ বিশ্বাসই করতে পারছে না যে অরুণিমা সশরীরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা দুষ্টু হাসি মুখে নিয়ে। থতমত খেয়ে বলে অনিরুদ্ধ বলে ওঠে, 'অরুণিমা... তুই... এখন?... কবে এলি? এই দেখ, কালুদা আমাকে জানাল না... আমি নিজে নীচে গিয়ে তোকে আপ্যায়ন করে নিয়ে আসতাম!' অরুণিমা হেসে বলে উঠল, 'তোর কালুদাকে আমিই বারণ করেছিলাম কিছু খবর না দিতে। আমি তোকে চমক দিতে চেয়েছিলাম।' অনিরুদ্ধ অবাক হয়ে অরুণিমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় বিশ বছর বাদে ওকে দেখছে।

এখনও হাসলে ওর গালে টোল পড়ে। মুখের চামড়ায় একটু খামচে ভাব পড়েছে, কিন্তু শরীরে এখনও যৌবন উপছে পড়ছে। শাড়িটাকে এমন যত্ন করে পরেছে যে দেখলে মনে হয় এক পূর্ণ যৌবনা নারী। একগাল হেসে অরুণিমা বলে উঠল, 'কেমন... চমকে দিলাম তো?... সেই আমেরিকা থেকে তোর সাথে আড্ডা মারতে এলাম।' অরুণিমা হাতের ব্যাগটা নীচে নামিয়ে রেখে, ঘুরে ঘুরে অনিরুদ্ধর ঘর বারান্দা দেখতে লাগল। চেয়ারটায় বসে বলে উঠল, 'তোর বাড়িটা এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন বল তো?... তুইও তো সেই একই রকম আছিস... সাদা পাজামার সাথে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি... একদম typical বাঙালি বাবু... সাংসারিক দিক থেকে কি পরিবর্তন হয়েছে?' অনিরুদ্ধ হেসে বলে উঠল, 'তোর আসল কৌতূহল নিবারণ করতে বলি, আমি এখনও নির্ভেজাল ব্যাচেলর আছি।... জীবনে আর কাউকে মনের মতো খুঁজে পাইনি। আমার দেখাশোনার ভার কালুদার উপর।' কথাটা বলেই কালুদা ডেকে গরম চা আনতে বলল। অরিন্দম এবার অরুণিমাকে বলল, 'তোর খবরটা আগে বল। হঠাৎ করে কানাডায় চলে গেলি বিয়ে করে... শুনেছিলাম, তোর বরের নাকি বিশাল কামাই... একটা আন্তর্জাতিক NGOর সাথে যুক্ত। একটা নেমন্তন্ন কার্ড পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভোজ খাওয়া হয়নি। তখন আমরা গ্রুপ নিয়ে শিলিগুড়ি চলে গেছিলাম। নায়িকার চরিত্রটা তো তোরই করার কথা ছিল। ফিরে এসে শুনলাম, তোরা কানাডাতে চলে গেছিস।... সেই থেকে আর কোনো খবর নেই। ভাবলাম, নতুন জীবন বেশ জমিয়ে উপভোগ করছিস... আমিও আর disturb করতে চাইনি তোর নতুন জীবনে।'

অরুণিমার মুখটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে মলিন হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওই অধ্যায়টা আমার জীবনের এক অন্ধকারময় অধ্যায়। আমার বাবা-মা ভেবেছিলেন আমি বাউন্ডুলে হয়ে যাচ্ছি। একটা ভালো ছেলে পেয়ে আমার জীবনটা বেঁধে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। ছেলেটির নাম সুপ্রকাশ। কানাডাতে দুই প্রজন্ম ধরে ওরা বসবাস করছে। ভারতে এসেছিল কোনো কাজে। সুপ্রকাশের বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। সেই সুবাদে বাবার সাথে যোগাযোগ হয়। বাবাও দেখল ছেলেটি দেখতে সুন্দর, বিরাট গাড়ি এই কলকাতার শহরে... আমার বিয়ের প্রস্তাব দিল। সুপ্রকাশেরও আমাকে পছন্দ হয়েছিল। ওর বাবাও আমার বাবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে দিল। আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের তিনদিন পরেই আমরা কানাডা চলে গেলাম। কলকাতার সাথে সম্পর্ক মুছে গেল।'

অনিরুদ্ধ হেসে উঠল। 'আমিও আমার নায়িকাকে হারিয়ে ফেললাম। আমার নাটক 'জীবন যখন যে রকম' এর সংলাপটা মনে আসছে।' অরুণিমা বলে ওঠে, 'আমিই তো সেই নাটকের নায়িকা ছিলাম।' খুব উৎসাহ নিয়ে বলে উঠল, 'আমার প্রথম নাটক তোর সাথে। ভীষণ নার্ভাস ছিলাম। সেই দৃশ্যটা আমার মনে আছে। বিয়ের পর আমার আগের প্রেমিকের সাথে প্রথম দেখা। তুই এসেছিস আমার বাড়িতে, আমার সাথে দেখা করতে।... মনটা আমার জড়তায় ভরে আছে। তুই আমার জড়তা কাটাতে তোর স্বভাবসিদ্ধ মতো আমার মনটা হাল্কা করার চেষ্টা করছিস। আমি বলে উঠলাম - স্বরূপদা, জীবনটা যে কখন কিভাবে বদলে যায়, কারও জানা নেই।' অরুণিমাকে থামিয়ে অনিরুদ্ধ সেই সংলাপটা বলে ওঠে, 'আমার এ জীবনে সবচেয়ে দুঃখের বিষয়টা হল এই যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কেননা আমি তো জানি যে তুমি আমার ভালোবাসার বিনিময়ে ভালোবাসতে পারবে না।... একদিন তুমিই আমাকে নিজের চোখে হারাবে, যেমনটা আমি আজ তোমায় হারাচ্ছি।'

অনিরুদ্ধর সংলাপটা শুনে অরুণিমা বলে ওঠে, 'তুই সেদিনও মঞ্চে আমায় কাঁদিয়েছিলি, আজও আমার মনটা বেসামাল করে দিলি।'

কালুদা চা আর পকোড়া নিয়ে হাজির হল। খাবারটা টেবিলে নামিয়ে বলে উঠল, 'দিদিমণি তোমায় আমি প্রথম দেখলাম। তুমি কি আবার বিদেশে চলে যাবে?' অরুণিমা হেসে ওঠে বলে, 'কালুদা, আমি আর ফিরে যাচ্ছি না, কলকাতাতেই থেকে যাব।' কালুদা বলে ওঠে, 'তবে কি তুমি নতুন করে কোনো নাটকের দল বানাবে? খোকাবাবু তাহলে একজন ভালো সাথী পেয়ে যাবে।' কালুদা ভিতরে চলে যায়। অনিরুদ্ধ আবার হাসতে হাসতে অভিনয় ভঙ্গীতে বলে ওঠে, 'বৃষ্টি ভেজা পথে হাঁটতে ভালো লাগে, কারণ সেই পথে তোমার হাতটা ধরে হাঁটার স্মৃতি জড়িয়ে আছে।' অরুণিমা বলে ওঠে 'তোকে আমার জীবনের পরবর্তী

ঘটনাক্রম বলা হয়নি। আর একদিন বলব', কথাটা বলেই অরুণিমা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। অনিরুদ্ধ ওর হাতটা ধরে চেয়ারে বসিয়ে বলে ওঠে, 'কতদিন বাদে এক সুন্দরী মহিলাকে পেয়েছি, আজ জমিয়ে আড্ডা হবে। বাড়িতে তো কেউ অপেক্ষা করে থাকবে না তোর জন্য... তবে এত তাড়া কিসের? বিকেলে সেই কাফেতে ফিশ ফ্রাই খেতে যাব, জানিনা দোকানটা আজও আছে কি না।'

কালুদা ভিতর থেকে ওদের বাদানুবাদ শুনতে পেয়েছিল, এবার ঘরে ঢুকে বলে উঠল, 'দিদিমণি, আজ পোস্ত বানিয়েছি... খেয়ে যাও দুপুর বেলা।' পোস্তর লোভটা বোধহয় অরুণিমা সামলাতে পারল না। জমিয়ে আড্ডায় বসে গেল।

অনিরুদ্ধ তাকিয়ে রয়েছে অরুণিমার দিকে, একদৃষ্টে। অনেকদিন বাদে অরুণিমাকে পেয়ে ওর মনে নতুন করে এক শিহরণ জেগে উঠেছে। যৌবনের দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে, কিন্তু অরুণিমাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর জীবনে বসন্ত এখনও জড়িয়ে আছে। ওর সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আছে সেই কৌমার্য, সেই উচ্ছলতা। একটু মুচকি হেসে বলে ওঠে, 'Inter versity Radio-play competition এ আমাদের trial দেবার কথা। সেই প্রথম আমাদের দুজনের দেখা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে আমরা নাটক করছি 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'। কলেজে রিহার্সাল আমাদের বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু Radio trial-এর দিন নাটকটায় আমি গলার modulation করতে পারছিলাম না। নাটকের একটা emotional মুহূর্তে, যখন দুজনকেই ঝুলন্ত মাইকের সামনে মুখোমুখি সংলাপ বলতে হবে, আমার গলা আটকে যাচ্ছিল। সকলেই যখন খুব চিন্তাগ্রস্ত, আমি তোকে আলাদা করে বলেছিলাম, তোর সংলাপ বলা হয়ে গেলে, মাইকের সামনে থেকে সরে যেতে, কারণ তোকে অত সামনে রেখে আমার ভাবাবেগে খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। তুই আমার অসুবিধাটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলি, তাই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলি, আমিও আমার স্বাভাবিক আবেগটা ফিরে পেয়েছিলাম।' অরুণিমা হেসে বলে উঠল, 'তুই কিন্তু খুব দুষ্টু ছিলি। তোর তির্যক দৃষ্টি দেখে আমারও বেশ মজা লাগছিল।... তোর ওই দুষ্টুমি ভরা চোখ আমি ভুলতে পারিনি, আর ভুলতে পারিনি তোর সংলাপ বলার মুহূর্ত।... সেই থেকেই তো, আমার মনে ইচ্ছে জেগেছিল, তোর সাথে অভিনয় করার।'

অনিরুদ্ধ বলে উঠল, 'এবার তোর অর্দ্ধসমাপ্ত কাহিনীটা শুনি... হঠাৎ তুই একাই চলে এলি কলকাতায়... তারপর তুই কালুদাকে বললি, কলকাতাতেই এখন থাকবি...'

অরুণিমা টেবিলে রাখা অনিরুদ্ধর ডায়েরিটা উল্টে উল্টে দেখছিল। এবার বলে উঠল, 'কানাডাতে আমার নতুন জীবন বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। সুপ্রকাশও ওর কাজ নিয়ে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াত। আমাকেও ওর সাথে নেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার মন লাগেনি। আমি নিজেকে গার্ডেনিং-এ জড়িয়ে নিয়েছিলাম। বিরাট বাগান জুড়ে নানারকম ফুল গাছ লাগাতে আমার খুব ভালো লাগত। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি মাতৃসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। তৃতীয়বারও যখন আমার miscarriage হয়ে গেল, তখন আমাকে বিভিন্ন ডাক্তারকে দেখান হল। তাদের সুচিন্তিত অভিমত পেলাম যে মাতৃত্বের বন্ধনে কখনোই নিজেকে আবদ্ধ করতে পারব না। ধীরে ধীরে দেখলাম সুপ্রকাশের মনও আর ঘরের মধ্যে সীমিত রইল না। একদিন সুপ্রকাশের বাবা মা ও চলে গেলেন। সুপ্রকাশ নিজের NGO নিয়ে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও নিঃসঙ্গতায় হাঁফিয়ে উঠলাম। কোথা দিয়ে যে বছরগুলো কেটে গেল বুঝলাম না। একদিন সুপ্রকাশকে বললাম, 'আমি ভারতে ফিরে যেতে চাই। ওখানেই নিজের মতো কিছু করতে চাই।' সুপ্রকাশ আমার কথা মেনে নিল... এমনকি বলেও দিল যে দরকার হলে Separation suit file করতেও ওর কোনো অসুবিধা নেই। আমিও ভাবলাম, কলকাতায় থাকার কোনো অসুবিধা নেই। কলকাতায় আমার নিজের বড় বাড়ি, খালি পড়ে আছে। বাবা-মা আমার জন্য যা fixed deposit রেখে গেছেন, তাতে আমার জীবন ভালোই কেটে যাবে। হঠাৎ মনে পড়ল তোর কথা। তুই এখনও active আছিস কি না। তাহলে তোর সাথে নাটক করে ভালোই সময় কেটে যাবে আমার। শেষপর্যন্ত একদিন সবকিছু ফেলে নতুন ভাবনা নিয়ে চলে এলাম ভারতে। সুপ্রকাশও কোনো আপত্তি করল না।'

অরুণিমার কথা শুনতে শুনতে অনেক বেলা হয়ে গেল। কালুদা ততক্ষণে টেবিলে খাবার সাজিয়ে

ফেলেছে। অনিরুদ্ধ চলে গেল স্নানের ঘরে নিজেকে fresh করে নিতে। অরুণিমা ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখতে লাগল। রান্নাঘরে গিয়ে কালুদার সাথে গল্প করল। খাবার টেবিলেই এসে বসল। কিছুক্ষণ বাদে অনিরুদ্ধও এসে গেল। বিকেল বেলা ওরা দুজনে গেল হাজরার মোড়ে কাফে রেস্তোরাঁতে। রাখালদা এখন আর নেই। দোকানটা আগের মতই আছে... সেই পুরোনো স্টাইলের চেয়ার-টেবিল... লোকজন সব নতুন। দোকানের মেনুটাও একই আছে। পর্দায় ঢাকা একটা কেবিনে ওরা মুখোমুখি একটা টেবিলে বসল। পুরোনো দিনেরই স্মৃতিচারণ চলছিল। অরুণিমাই বলে ওঠে, 'তুই কি এখনও হাত দেখার স্বভাবটা বজায় রেখেছিস?' অনিরুদ্ধ হেসে বলে উঠল, 'এখন আর সেই সুন্দরীরা জীবনে আসে না যে আমার মনকে প্রলুব্ধ করবে, ওদের হাত দেখতে।' হেসে উঠল অরুণিমা। নিজের হাতটা এগিয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা, এবার আমার হাতটা দেখে বল, আমার জীবন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' অনিরুদ্ধ ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে বলে উঠল, 'তোর হাতটা আজও বেশ নরম আছে, মনেতে রোমাঞ্চ জাগায়।' দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব থাকে। অরুণিমা আস্তে করে নিজের হাতটা সরিয়ে বলে, 'আজ এইভাবে আমার মনটা হালকা করা হয়তো ঠিক হচ্ছে না।' অনিরুদ্ধ নাটকের সংলাপে বলে ওঠে, 'তোমার পাশে থাকলে মনে হয় এই পৃথিবীটা কত সুন্দর! তুমি পাশে না থাকলে সবকিছুই যেন ফাঁকা লাগে।' বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। অরুণিমা বলে ওঠে, 'তুই এখন আর আশুতোষ কলেজের ছাত্র নোস যে কাফেতে বসে প্রেমের ছন্দ ওড়াবি।' খাওয়া শেষ করে ওরা দুজনেই উঠে পড়ে। সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আসছে। অনিরুদ্ধ বলে ওঠে, 'দিনটা তোর সাথে বেশ ভালোই কেটে গেল।' অরুণিমা হাসিমুখেই উত্তর দিল, 'চিন্তা করিস না। কলকাতায় যখন এসে গেছি, আর তোকেও free পেয়ে গেছি, তখন তোকে bore করতে অনেকবার আসব।.. তোর নতুন লেখা নাটক শুনব... তোর কাছ থেকে জানতে হবে, কিভাবে আবার আমার নতুন জীবন শুরু করব।' অরুণিমা ওর গাড়িতে চলে গেল। অনিরুদ্ধও কিছুক্ষণ বাদে একটা ট্রামে উঠে বসল।

অনিরুদ্ধ ভাবছিল অরুণিমারই কথা। জীবনের গতি কিভাবে একটা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে। অরুণিমার সাথে একটা সময় মঞ্চ দাপিয়ে বেড়িয়েছি দুজনে। বেশ কিছু নাটক একসাথে করতে করতে ওরা একটা ভালো জুটি বানিয়ে ফেলেছিল। অরুণিমাই প্রলুব্ধ করেছে অনিরুদ্ধকে নতুন নাটক লিখতে। সেইভাবেই একটা নতুন স্বাদের নাটক লিখেছিল, 'এক বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায়'। অরুণিমার মিষ্টি expression এ নাটকটা খুব জমে গেছিল। শিলিগুড়ি থেকে ওদের একক নাট্যসভায় আমন্ত্রণ পেয়েছিল। পরপর তিনটে নাটক করতে হবে। রিহার্সাল চলাকালে অরুণিমা ওর নতুন জীবনের কথা ভাঙ্গল। কথাটা শুনতে ভালো লেগেছিল, কিন্তু অনিরুদ্ধর মন ভেঙ্গে গেছিল। ওর নাট্য পরিকল্পনা মুষড়ে পড়েছিল। বাস্তবকে মানা ছাড়া কোনো গতি নেই। নতুন করে দলকে গুছিয়ে যেতে হয়েছিল শিলিগুড়ি। দীর্ঘ বিশ বছর কোনো যোগাযোগই ছিল না। হঠাৎ আজ ধুমকেতুর মতো আবার হাজির হয়ে গেল অরুণিমা। অনিরুদ্ধ নাটক করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, নাটকের একটা শিক্ষায়তন বানিয়েছিল। সেই নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখত। বিভিন্ন সাহিত্যসভার আমন্ত্রণে কবিতা পাঠ করতে যেত। অরুণিমার মধ্যে আজ নতুন করে সেই পুরোনো দিনের উচ্ছলতা দেখে অনিরুদ্ধর মনেও একটা নতুন আশার সঞ্চার হল। নিঃসঙ্গতার মাঝে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ওর মনটা স্তিমিত হয়ে গেছিল। মনেতে আবার নতুন করে এক চঞ্চলতা ফুটে উঠল। অরুণিমার সাথে অভিনয় করতে করতে দুজনেই একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছিল। এরই মধ্যে কখন যে অনিরুদ্ধর মনে অরুণিমার প্রতি একটা মোহ জন্মে গেছিল, অনিরুদ্ধ তা বুঝতে পারেনি। কখনও নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারেনি যে অরুণিমাকে সে সারা জীবনের জন্য নিজের পাশে চায়। মনে একটা সঙ্কোচ ছিল যে অরুণিমা যে ধরণের বাঁধন ছাড়া মেয়ে, তাতে ও যদি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে হয়তো ওর নাটকের দলই ভেঙে যাবে। এতদিন বাদে অরুণিমাকে সারাদিন কাছে পেয়ে মনে হয়েছে, অরুণিমা সেই আগের মতনই বাঁধনছাড়া মেয়ে আছে। যখন শুনল যে অরুণিমা আর ফিরে যাবে না কানাডাতে, অনিরুদ্ধর মনে এক নতুন করে শিহরণ জেগে উঠল।

অরুণিমা বাড়িতে একলাই থাকে। বিরাট বাড়ি, ওর বাবাই পুরোনো বাড়ি কিনে তাকে পছন্দমতো

renovate করে নিয়েছিলেন। ওর বাবা মারা যাবার পর অরুণিমা একবার বাড়ি এসেছিল। বাড়ি দেখাশোনা করার জন্য স্বামী-স্ত্রীর এক পরিবার থাকত, আজও ওরাই বাড়িটা দেখাশোনা করে। ওর মা-ও একদিন চলে গেলেন। তখনও অরুণিমা এসেছিল। বাড়িটা গুছিয়ে চলে গেছিল, বাড়ি দেখাশোনার ভার সেই পরিবারের হাতে ছেড়ে। এবার এসে নতুন করে সব গুছিয়ে নিয়েছে। কানাডা থেকে আসার সময়, নিজের ব্যক্তিগত জিনিস ছাড়া, সব কিছুই ফেলে এসেছে। সুপ্রকাশ বলেছিল, কিছু দরকার হলে ওকে জানাতে। অরুণিমার মনে তখন একটাই আলোড়ন চলছিল যে কলকাতায় এসে কিভাবে নতুন জীবন শুরু করবে। দীর্ঘদিন নিজেকে নিঃসঙ্গতার সাথে জড়িয়ে অরুণিমা হাঁফিয়ে উঠেছিল। পুরোনো দিনের স্মৃতি আওড়াতে আওড়াতে মনে পড়েছিল অনিরুদ্ধর কথা। অরুণিমার অভিনয় জীবনটা বলতে গেলে অনিরুদ্ধই সাজিয়ে দিয়েছিল। রাতের পর রাত একসঙ্গে অভিনয় করতে করতে ওরা দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছিল একে অপরের কাছে। ওদের এই সমঝোতা ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেনি অরুণিমার বাড়িতে। অরুণিমাও নিজের জীবনের স্থিরতা ঠিক করতে পারেনি। সুপ্রকাশকে প্রথম দেখে ওর ভালোই লেগেছিল। বিশেষ করে ওর আর্থিক স্বচ্ছলতা অরুণিমাকে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য আকৃষ্ট করেছিল। হাতের কাছে ভালো পাত্র পেয়ে অরুণিমার বাবা-মা ওদের বিবাহের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিলেন। বিশ বছর ধরে অরুণিমা বিদেশের পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি। কলকাতায় আসার আগে তাই নতুন করে ভেবেছিল, যদি অনিরুদ্ধ নিজের জীবন সাজিয়ে নেয়, তবে ও কি করবে? আজ অনিরুদ্ধকে পুরোনো অবস্থায় দেখে ও চমকে গেছে। সারাদিন অনিরুদ্ধর সাথে কাটিয়ে অরুণিমার মনেও এক শিহরণ এসেছে। অরুণিমার মনে হচ্ছে, তবে কি ও নতুন করে ওর অভিনয় জীবন শুরু করতে পারে অনিরুদ্ধর সাথে?

রাতের অন্ধকারে অরুণিমা বসেছিল ওর বাড়ির দোতলার বারান্দায়। নানান কথা মনে আসছিল। বিয়ের আগের জীবনটা সত্যিই বাঁধন ছেঁড়া জীবন ছিল ওর। অরুণিমা বরাবরই দেখতে খুব সুন্দর ছিল। নিজের শরীরের প্রতি আত্মসচেতন ছিল। ওর বাবার অফিসে product media plan করত এক agency। সেখানে কাজ করত বিভাস দা। ভীষণ creative ছিল। অরুণিমার চেহারার গড়ন দেখে, ওকে offer দিয়েছিল, একটা interior decorating কোম্পানির হয়ে মডেলিং করতে। প্রস্তাবটা বেশ interesting লেগেছিল অরুণিমার। তখন ও সবে কলেজে ঢুকেছে। বাড়িতে কাউকে না বলে shoot করতে গেছিল। বিভাসদাই সঙ্গে ছিল। নানারকমভাবে ওকে ফটো দিতে হয়েছিল। বিভাসদা বলেছিল ওর কিছু ফটো ওদের ফটো ব্যাঙ্কে রেখেছে। কোনো client তাদের product এর জন্য পছন্দ করতে ওকে জানাবে ওর অনুমতি নেওয়ার জন্য। বিভাসদাই বলেছিল যে মডেলিং লাইনে প্রচুর পয়সা আছে। অরুণিমার বাবা-মা, এই ঘটনাটা একদিন জেনে ফেলল। বাড়ি থেকে ভীষণ আপত্তি জানান হল। শেষ পর্যন্ত অরুণিমাকে মডেলিং থেকে সরে আসতে হল। বসে বসে ভাবছিল, একবার বিভাসদার খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। এখন তো আর ওকে বাধা দেবার কেউ নেই। একটা নতুন দিশায় নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া যায়। এখনও তো ওর শরীরটা বেশ মজবুত আছে। নিজের মনেই একটা চাপা হাসি খেলে যায়।

মনে পড়ে যায়, কি করে এই অভিনয়ের উপর ওর আগ্রহ জন্মেছিল। স্কুলে পড়াকালীন অরুণিমার আবৃত্তি করার অভ্যাস ছিল। বাড়িতে সুর করে করে ছড়া বলত সেই ছোটবেলা থেকে। 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে, উঁকি মারে আকাশে...', কিংবা

'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকেবাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে...'

সেবার কলেজে ঠিক হল শিশুদিবস উদযাপন করার। অরুণিমার উৎসাহ দেখে ওর বন্ধুরা চেয়েছিল অরুণিমা একটা কবিতা আবৃত্তি করুক। অরুণিমাও রাজিয়ে হয়ে গেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কবিতা পাঠ করেছিল, 'ছোট বড়'

'এখনও তো বড় হইনি আমি
ছোট আছি ছেলেমানুষ বলে...'

ওর কবিতা পাঠ দারুণ লেগেছিল সকলের। বাংলার প্রফেসর, গোবিন্দবাবু ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বেতার নাটকের রিহার্সালে। Inter Versity Radio Play প্রতিযোগিতায় কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় নাম registry করেছিল। এইরকম আমন্ত্রণ সরিয়ে রাখতে পারেনি অরুণিমা। সেখানেই দেখা হয়েছিল অনিরুদ্ধর সাথে। অরুণিমার ভালো লেগে গেছিল অনিরুদ্ধর গলার voice ওর নায়কোচিত appearance । পরবর্তী সময় অনিরুদ্ধর নাটকের দলেই জমে গেছিল।

নানা রকম মুহূর্তের সন্নিবেশে রাতের সময়টা কেটে গেল।

পরদিন সকালে অরুণিমা নিজেকে তৈরি করে নিল। বিভাসদার খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল। বিভাসদার অফিসটা ছিল গ্র্যান্ড হোটেলের তলায়। ওখানে গিয়ে শুনল বিভাসদা গত হয়েছেন। অফিসটা অন্যরকম করে সাজানো হয়েছে। অনেক নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে একজন সাগরদাকে দেখতে পেল। ভদ্রলোকের বয়স হয়ে গিয়েছে। গালভর্তি দাড়ি ঝুলে রয়েছে, মাথার চুল আগের মতো উস্কোখুস্কো... অনেক পুরোনো কর্মী ওদের সংস্থার। নানারকম creative idea নিয়ে poster clip তৈরি করেন। সকলেই ওনাকে সাগরদা বলত। সেই ভদ্রলোক অরুণিমাকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। একগাল হেসে বলে উঠলেন, ‘কতযুগ বাদে আপনাকে দেখছি... ভেবেছিলাম, এসব মিডিয়া লাইন ছেড়ে সংসার ধর্ম করছেন।... কিন্তু শরীরটাকে তো বেশ ধরে রেখেছেন?’! অরুণিমা সাগরের কেবিনেই একটা সীট নিয়ে বলল, ‘সংসার ধর্ম করতেই তো চলে গেছিলাম সাগরপাড়ে, এ দেশ ছেড়ে... কিন্তু আমার দ্বারা হল না। তাই ফিরে এলাম এই দেশেই জীবনটাকে নতুন করে ভাবতে।’ সাগর বলে উঠল, ‘বিভাস বেশ ভালোই কাজ করছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোভিডে চলে গেল।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুণিমা বলে উঠল, ‘বিভাসদার কথা মনে রেখেই কলকাতায় চলে আসা... এখন দেখা যাক্ আমার ভাগ্যে কি আছে?’ কথায় কথায় সাগর বলে উঠল, কি ধরণের কাজ খুঁজছেন?’ অরুণিমা বলে উঠল, ‘আজকাল তো digital যুগ এসে গেছে। বিজ্ঞাপন ছাড়াও পর্দার আড়ালে অনেক ধরণের কাজ করা যায়।’ সাগর নানান বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলছিল। অরুণিমা ওর পুরোনো background নিয়ে জানিয়ে দিল যে ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, মঞ্চে অভিনয়ও করেছে। মনোরঞ্জন জগতে কাজ করতে সুবিধা হবে। সেদিন সাগর অরুণিমার photogenic face পরীক্ষা করার জন্য, নানানভাবে ওর কিছু ফটো নিয়ে নিল। তারপর হেসে বলল, ‘দেখি তুমি এই test-এ পাশ করতে পার কিনা। সাগরকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এল অরুণিমা।

সন্ধ্যাবেলা অনিরুদ্ধ ওর নাট্য শিক্ষায়তন নিয়ে বসেছে। সেদিন ওদের বিষয়টা ছিল, কবিঠাকুরের লেখা ‘বাঁশি’ কবিতা পাঠ। কবিতাটার মধ্যে গলার প্রচণ্ড modulation আছে, সেটাই বোঝাচ্ছিল অনিরুদ্ধ।

নিজেই কিছুটা আবৃত্তি করে ওঠে,

‘বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি,
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে,
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্ ধস্
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি হাঁকা হাঁকি,
সাড়ে দশ বেজে যায়।
তারপর ঘরেও এসে,
নিরালা নিঝুম অন্ধকার।’

ঘরে ঢুকে পড়ে অরুণিমা। সকলে ওর দিকে তাকায়। অরুণিমা হেসে জবাব দেয়, ‘থামলি কেন?... এর শেষ পংক্তিটা আমি বলি?... কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে ওঠে,

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধুলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী;
তীরে তমালের ঘন ছায়া;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।’

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিরহ

দয়মন্তী

ফাল্গুনের শেষ মাধুরী আসিয়া, চৈতের গাছটিরে নাড়া দিয়া প্রশ্ন করিল, কি হইয়াছে, কথা কহিতেছ না কেন? রুগ্ন হাড়ে কাঁপুনি দিয়া কাতরভাবে বলিয়া উঠিল। সে আসে নাই! এবার বুঝি সে আঁখি তুলিয়া বলিল, সে এখন আসিবে না।

আঁখি তার জল ভরিয়া গিয়াছে। ওষ্ঠে মৃদু-মৃদু কম্পন লক্ষ্য করিয়া মাধুরী আবার বলিল তাঁরে বাঁধ নাই কেন? অঞ্চলখানি তোমার যায়নি হারিয়ে। তবে আজ কাঁদিতেছ কেন সই!

বাঁধিব কোন স্পর্ধায় বল সখি। আমার বাঁধন চিরদিনই আলগা।

মাধুরী, সে আসিবে। দেখিও আরো প্রেম লইয়া তোমার দ্বারে আসিবে।

তখন তাহাকে ক্ষমা করিও না। স্পর্ধা তাহা হইলে আরো বাড়িয়া যাইবে।

সে মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, ও কথা বলিও না। তোমায় মিনতি করি তাঁরে একটু ভালোবাসিও।

তাঁহার ডাগর চোখে জলের ধারা নামিল। মাধুরীর আঁখি ছলছল করিয়া উঠিল। সে দুই হাতে সইর পান্ডুর মুখখানি তুলিয়া সিক্ত মুখমণ্ডলে চুমু খাইল। তাহাতে আরো কান্না বাড়িয়া গেল, সে কহিল যাইবার পূর্বে সে এমনি করিয়া তাঁহাকে আদর করিয়াছে।

এমন সোহাগ সে জীবনে আর কোনোদিন করে নাই। এখন উহাকে কিভাবে ভুলিয়া থাকিবে। মাধুরী এক বুক নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, তোকে সে যেভাবে ভুলিয়া আছে সেইভাবে সই।

চৈতের ঝরাপাতা মাথা নাড়িয়া বলিল তাহা যে হইবার নয়, কারণ তাহার স্পর্শ এখনো অধরে লাগিয়া আছে। তাঁহার ঘ্রাণ এখনো সমস্ত হৃদয় ভরিয়া বিরাজ করিতেছে।

সে রোদন করিয়া উঠিল। কহিল, তুই যা সখি। যা ভুলিবার নয় তাহা ভুলিব না কোনোদিন।

মাধুরী কম্পিতস্বরে কহিল হতভাগিনী পাষণ্ডকে ভালোবাসিয়া তুমিও মরিতে বসিয়াছ। তার সিক্ত আঁখি দুটি আবার বর্ষায় ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, সখি! এ জনমে যদি তারে না পাই পরজনমে যেন তারে পাই এমন আশীর্বাদ করিও মোরে।

তাঁহার আঁখিতে শ্রাবণের ধারা নামিল, স্বররুদ্ধ মাধুরীর কোলে মূর্ছা গেল। মাধুরীর হৃদয় শিশিরময় প্রভাত হইয়া উঠিল।

তাহার কিঞ্চিত কুয়াশা সইর মুখমন্ডলের উপর পড়িয়া মেঘাচ্ছন্ন হইল।

চৈতের গাছটির একটি পত্র ছিন্ন হইয়া পড়িল ভূমির পরে। উলঙ্গ গাছটিরে বক্ষে জড়িয়ে মাধুরী তাঁর লজ্জায় সে ও লজ্জিতা।

মাধুরীর স্নেহসুধায় সে আবার নতুনপত্র লাভ করিয়া, হইয়া উঠিল কিশলয়।

মাধুরীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, সে আসে নাই? মাধুরী! আসিয়াছে।

আমায় ছাড়িয়া দাও, চাহিয়া দেখ নিজেরে। সে আঁখি খুলিল মৃদু মৃদু হাসিল।

শিহরণ অনুভব করিল তাঁর দেহে। তাঁর আনন্দে মাধুরী চঞ্চলা হইয়া উঠিল, তার দেহ হিন্দোলিত হইল।

সে কহিল, সই! সে আসিবে জানিতাম তথাপি

বেদনাভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁর রক্তাভ গালে লজ্জার ছোপ পড়িল।

মাধুরী, তবে আমি যাই?

না-সই, যাই কহিও না, বল আসি, বিদায় নয় এস উভয়ে আলিঙ্গন করি।

তুমি সবুজ,

আমি ঝরাপাতা।

বাতাস ভরিয়া উঠিল, মাধুরী অঞ্চলদ্বারা মুখ আবৃত করিল।

সে খিল-খিল শব্দে হাসিয়া ঝরিয়া পড়িল তারই গালে।

সে, কহিল, তাঁকে আসিতে হইবে মোর দ্বারে।

বর্তমান যুগের ছড়া

কালীসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখবো ছড়া পড়বে কারা
সবাই এখন মোবাইল ধরা,

মা বাবার নাই ফুরসত
তিন বছর পর করে করসত
কি করে পাঠাবে ছানাকে স্কুলে
পয়সা জোগাড় করে দুজনে মিলে
স্কুলে গেলেই বাঁচে তারা
ঘরে এলেই মোবাইল ধরা।

আর কত কি দেখতে হবে
আমাদের সময় ফুরোলো এবে,

জন্মাক ছানা হাতে গোনা
তারা পাবে না দাদু দিদিমা
বলবে তারা মাম ড্যাড
বর্তমান সময় নট ব্যাড।

পাত্র চাই

পাত্রী - নয়নিকা মন্ডল

জন্ম ঃ ১৪ই মে, ১৯৯৯

উচ্চতা ঃ ৫ ফুট ২ ইঞ্চি

শিক্ষাগত যোগ্যতা - BMS (DU), MBA (IIM Bod Gaya)

পেশা ঃ Sr. Manager, Amazon

পিতা ঃ নির্মল কুমার মন্ডল, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী।

মাতা ঃ শিক্ষিকা, দিল্লি সরকারের অধীন্যস্ত

ভাই-বোন ঃ দুই ভাই এক বোন

যোগাযোগ ঃ mnrimal1426@ggmail.com
9891139266

উপযুক্ত পাত্র কাম্য।

পাত্র চাই

পাত্রী ঃ মেঘা রাহা

বয়স ঃ ৩১

গণ ঃ দেব গণ

গোত্র ঃ অত্রি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ MTech(CSE) from IPU

পেশা ঃ বর্তমান Big4 কোম্পানিতে Senior Software ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত (বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা বেতন)

পিতা ঃ মাদার ডেয়ারি থেকে অবসরপ্রাপ্ত

মাতা ঃ গৃহিণী

যোগাযোগ ঃ 9871150690

উপযুক্ত পাত্র চাই

লাল শাড়ির মৃত্যু নেই

শ্রাবণী চ্যাটার্জী

শেষ পর্ব

চাকরিতে জয়নিং এর প্রথমদিনটাতেও রঞ্জন আবার খুব বড় রকমের ধাক্কা খেল। অধরা স্বপ্ন WBCS অফিসারের পিয়ন রঞ্জন চৌধুরী। একছুটে তরতরিয়ে যেমন উঠেছিল তিনতলায়, তেমনি এক ছুটে নেমে এসেছিল একতলায়। নীচে এসে বাইরের বেঞ্চে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে। কিছুক্ষণ পর চোয়াল শক্ত করে চোখ মুছে মাথা তুলতেই দেখেছিল অফিসার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলেন, জানি অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছো, কষ্ট তো হবেই। জীবনকে পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে তো নিতেই হয়।

রঞ্জন কিছু উত্তর দিতে পারেনি। তবে ওর বোবা চাহনিতে অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়ার গল্প ছিল! অফিসের কেউ জানতেও পারেনি যে রঞ্জনের WBCS অফিসার হওয়ার স্বপ্নটাই হারিয়ে গিয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বিতীয় বিভাগে সে পাশ করায় পরে অবশ্য তার ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ হয়েছিল। লেখাপড়ার ইতি হয়ে গিয়েছিল কৈশোরেই। রত্নারও ক্লাস নাইনটুকুই।

তারপর মাস খানেকের মধ্যে মা সুস্থ হয়ে উঠল বটে। কাজকর্ম সবই করত কিন্তু কিছুতেই একা ঘরে থাকতে পারত না। মাঝে মাঝে সবকিছু ভুলে যেত। মায়ের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগলেও এবার মা সুস্থ হয়ে উঠেছিল। তবে বাবার কথা আর কোনওদিনই বলেনি ওর মা। হয়তো ভুলেও গিয়েছে!

এই ক'বছরে রঞ্জন খুব সংসারী হয়েছে। আর মা-বোনের প্রতিও দায়িত্ববান হয়ে উঠেছে।

সময় মানুষকে অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়।

রঞ্জনের চোখে রত্না যেন ক্রমে বড় হয়ে উঠছে!

ভালো পাত্র পেয়ে রঞ্জন ওর অফিসের বন্ধুদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে রত্নার বিয়ে দিল। আর বছর না ঘুরতেই ওর মা সম্বন্ধ করে কমলিকাকে বউ করে নিয়ে এনেছিল।

কমলিকা খুব উজ্জ্বল, ছটফটে আর খুব মিশুকে। কোনও দিন তার কোনও অভাব অভিযোগ ছিল না। এমন বউমা পেয়ে মাও সব ভুলে বেশ খুশিতে থাকত। কমলিকার গায়ের রঙ খুব ফর্সা। ভোরবেলা উঠে স্নান সেরে মাথা ভর্তি সিঁদুর আর কপালে সিঁদুরের বড় টিপ পরত। এমন সাজ রঞ্জনের মায়ের ভীষণ পছন্দের ছিল। উনি বলতেন বৌমা তুমি না শুধু লাল লাল রঙের শাড়ি পরবে। লালশাড়িতে তোমাকে ঝলমলে লাগে। রঞ্জনও তাকিয়ে দেখত আর বলত সত্যিই মা, তুমি ঠিকই বলেছো। লাল শাড়িতে কমলকে বড় ভালো লাগে। রঞ্জন যখনই কমলিকার জন্য শাড়ি কিনত তাতে লাল রঙের ভাগই বেশি থাকত।

সেই থেকে এতগুলো বছর সুখেই কেটেছে ওদের।

নিজের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলো মেয়ে বর্ণার মধ্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে রঞ্জন। রোজগার যদিও কম ছিল কিন্তু কষ্ট করে মেয়েটাকে দাঁড় করিয়েছে। ছ'মাস হল বর্ণা চাকরি পেয়েছে। এখন বোলপুরে আছে।

পেরিয়ে গিয়েছে অনেকগুলো বছর। দু বছর হল রঞ্জনের মা মারা গিয়েছেন।

বাবা মারা যাওয়ার পর এক নিমেষে বড় হয়ে যাওয়া রঞ্জন সংসারের প্রতিটা মানুষের সমস্ত দায়-দায়িত্বগুলো যথাসাধ্য সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছে। শুধু সময় দেওয়া হয়নি নিজেকে আর কমলিকাকে।

এই কদিনে বাড়িটা যেন ভীষণ রকম ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এখন মা নেই, বর্ণা সপ্তাহে মাত্র দুদিন থাকে। ও চলে গেলেই বাড়িটা কেমন যেন থমকে যায়।

কমলিকা বলে সেটা ঠিকই বলেছ। মেয়েটা চলে গেলে বুঝতে পারি আমার মতো তোমারও মনটা খারাপ হয়ে যায়।

রঞ্জন বলে জানো কমল, আমি ঠিক করেছি বর্ণার বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব। শুভকাজ ফেলে না রাখাও ভালো। অসীম খুব ভালো ছেলে। ভাবছি, আমরা সামনের মাসেই ওদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করে আসব।

কমলিকা বলে সে নয় হল। কিন্তু আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো?

রঞ্জন বলে না গো কিছু হয়নি। আজ অনেকদিন বাদে মনে হচ্ছে আমি শুধু তোমাকেই কোনও সময় দিতে পারিনি। কমল, কত অল্পেতে তুমি সারাজীবন খুশি থেকেছো। মুখ ফুটে কোনও দিন কিছুই চাওনি। যদিও, কিছু চাইলে তখন দেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না আমার। এখন মেয়েটা চাকরি পেয়ে আমার অনেকটা সুরাহা হয়েছে। আমার অনেকটা দায়িত্ব ও নিয়ে নিয়েছে।

কমলিকা আরও ঘন হয়ে বসে রঞ্জনের হাতটা ধরে বলে বেশ তো, আজকে দাও। রঞ্জন বলে কি চাও বলো।

কমলিকা বলে লাল রঙের উপর একটা পিওর সিল্ক বা ওই ধরনের একটা কোনও ভালো সিল্কের শাড়ি কিনে দেবে? রিয়ার বিয়েতে পরবো।

রঞ্জন বলে ঠিক আছে, আজ অফিস থেকে ফেরার সময় শাড়িটা কিনেই নিয়ে আসবো। কিন্তু কথা দাও, শাড়িটা কিনে আনলেই তুমি সঙ্গে সঙ্গে পরে আমাকে দেখাবে বলো?

কমলিকা বলে সেকি নতুন শাড়ি ফলস-পিকো ছাড়া পরা যায় নাকি!

রঞ্জন বলে, খুব পরা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, না পরলেও তুমি শাড়িটা সুন্দর গায়ে জড়িয়ে আগে এসে আমাকে দেখাবে। তারপর কি যেন বলে... ওইসব ফলস-পিকো বসিয়ে সবাইকে দেখিও। আগে আমি দুচোখ ভরে তোমাকে দেখবো লাল সিল্কের শাড়িতে।

কমলিকা মনে মনে ভাবে কি হলো আজ মানুষটার! এত বছরেও ওকে এমন তো কখনও দেখিনি! এমন করে ভালোবাসার কথাও তো কোনও দিন বলেনি!

এরপর রঞ্জন কমলিকাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে তার বুকে নিজের মাথাটা রাখল। আবেশে দুটো শরীর এক হয়ে গেল। বাধা না দিয়ে অনেক বছর পর এমন শান্তির ভালোবাসা অনুভব করল কমলিকা।

মৌনতা ভেঙে রঞ্জন বলল কমল বড্ড দেরি হয়ে গেল গো। অফিসেও আজ অনেক কাজ আছে। শিগগিরি ভাত বাড়ো, এখনও আমি রেডি হয়ে আসছি।

তাড়াহুড়ো করে খেয়েদেয়ে ব্যাগ নিয়ে স্কুটার বার করে বেরিয়ে যাবার সময় রঞ্জন কমলিকার দিকে তাকিয়ে খুব সুন্দর করে হাসলো। (আবারও কমলিকা মনে মনে বলে উঠল, জীবনে এই প্রথমবার অফিস বেরোনোর সময় ও এমনভাবে আমার দিকে তাকালো!) স্মিত হেসে কমলিকা বলল দুগ্গা দুগ্গা দুগ্গা। খুব সাবধানে যাবে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে দিয়ে কমলিকা চমকে উঠল! ও! মা! হেলমেটটা তো নিয়ে যায়নি! আমিও দিতে ভুলে গেলাম কি করে।

রঞ্জনদের দুটো ঘরের জানলা থেকেই রাস্তার মোড়টা দেখা যায়। গুটিকয়েক বাড়ি নিয়ে পাড়াটা। সামনের বড় রাস্তা ছেড়ে বাড়ির পথে ঢুকতে হয়। ঢুকেই ডানদিকে তিনটে বাড়ি ছেড়ে চার নম্বর ওদের বাড়ি। আবার সামনের বড় রাস্তা দিয়ে কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে ঘুরলেই মেন রোড। এটা আবার চৌমাথা। প্রতিমুহূর্তে লক্ষ গাড়ি ছুটছে।

সন্ধ্যেবেলা থেকে কমলিকার মনটা কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। অন্যদিন রাতের রান্না সেরে নিয়ে সকালের যোগাড়টাও করে রাখে। রঞ্জন ফিরলে তবে দুজনে বসে চা খায়।

আটটা বেজে গেল, ও তো এত দেরি করে না!

সকালের কথাগুলো মনে পড়তেই মনে মনে হাসি পেল। বাব্বাঃ! যাবার আগেও বলে গেল ফেরার সময় শাড়ি কিনে নিয়ে আসবো কিন্তু। তুমি কথা দিয়েছো পরে দেখাবে...!

ঠিক আছে বাবা দেখাবো, দেখাবো। তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো তো।

কড়ার মধ্যে খুন্তিটা আজ যেন বেশি রকমের চলছে। সেই আওয়াজটা একটুও ভালো লাগছে না। আবার ঘরের জানলা দিয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। এমনই চলতে চলতে ন'টা বাজল, দশটা বাজল।

এবার জানলা দিয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে তাকাতেই কমলিকার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ওখানে অত ভিড় কেন? কারা যেন চিৎকার করে কিছু বলছে! মন্টু, বিতান, রাজু'রা তো সামনের রকে বসে সন্ধ্যেবেলা আড্ডা মারে। এত রাতে ওখানে ওরা কি করছে? ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার জন্য ওদিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল এদিকে কেউ এলেই তাকে জিজ্ঞাসা করবে।

হঠাৎ দরজায় খট খট শব্দ। আসছি, আসছি।

কমলিকা ছুটে গিয়ে দরজা খুলেই দেখে বিকাশ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তার হাতে দুটো প্যাকেট। কমলিকা তাকে বলে রাস্তার মোড়ে অত চেঁচামেচি হচ্ছে কেন রে? কি হয়েছে ওখানে?

কমলিকাকে ওরা সবাই খুব পছন্দ করে। প্রায় ইয়ার্কি-ফাজলামির সম্পর্ক। কিন্তু এই মুহূর্তে একটু গম্ভীর ভাব এনে কমলিকার কথার উত্তর না দিয়ে বিকাশ বলে বউদি এগুলো ঘরে রাখো। সেই সন্ধ্যে থেকে এগুলো দাদার স্কুটারে ঝুলছিল। দিয়ে যেতে একটু দেরি হয়ে গেল। এখন আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে কমলিকা দেখে একটা প্যাকেটের ভেতরে একটা কাপড়ের বাক্স! আর একটার ভেতর বড় করে বাঁধানো একটা গোলাপের বোকে আর এক বাক্স মিষ্টি। কমলিকা আবার জিজ্ঞাসা করল এ-এ-এগুলো কোথায় পেলি! স্কুটারে ঝুলছিল কেন?

কমলিকার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন যেন কেঁপে উঠল। চেঁচিয়ে বলে উঠল বুঝতে পারছিনা কি বলতে চাইছিস? তোর দাদা...!!!

বিকাশ বলল তুমি কিছু শোনো নি? এসে সব বলছি বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কমলিকার মনে কেমন যেন ভয়ের নিশান উঁকি দিল। সকালে হেলমেটটাও নিয়ে যায়নি। আর ভাবতে পারছি না!

কোনও কথা না বলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরে এসে এক মুহূর্তে প্যাকেট থেকে শাড়ির বাক্সটা বার করল। একটা লাল সিল্কের শাড়ি। তারপর এক ঝটকায় শাড়িটা খুলে পরে নিল। আঁচলটা খুলে মাথায় আধা ঘোমটা টেনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল নাঃ, লাল শাড়ির মৃত্যু কিছুতেই হতে পারে না... দু হাতে মুখ ঢেকে আয়না থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল।

কমল কমল বলে ডাকতে ডাকতে রঞ্জন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। কমলিকা রঞ্জনের গলা পেয়ে ওই ভাবেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রঞ্জনকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। রঞ্জন বলল, দেখো না কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

কমলিকা বলে তার মানে?

রঞ্জন বলে তুমি কিছু শোনো নি? বিকাশ তোমায় কিছু বলেনি?

কমলিকা নিজেকে একটু ধাতস্থ করে নিয়ে বলে না তো! বিকাশ তো একটু আগে এসে আমার হাতে এই শাড়িটা, গোলাপের বোকে আর মিষ্টির বাক্সটা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কথার মাঝে রঞ্জন বলে শাড়িটা তোমাকে দারুণ মানিয়েছে। শাড়িটা পরে তুমি আমাকে প্রথম দেখাবে বলেছিলে তুমি আমার সেই কথা রেখেছো। কিন্তু তোমার চোখ মুখ এমন লাগছে কেন বুঝতে পারছি না তো!

কিছুক্ষণ আগে যে আশঙ্কার মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার মনে, আর কি ভুলটাই সে করতে যাচ্ছিল যে কথা কোনওভাবেই রঞ্জনের কাছে প্রকাশ করল না কমলিকা। বলল, না না, কিছু হয়নি। দেরি দেখে চিন্তা হচ্ছিল।

রঞ্জন বলল আজ একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরছিলাম।

সকালে বেরোবার মুখে মন্টু, বিকাশ, পাপ্পা বলল রাতে ওদের পিকনিক হবে ননীদের বাড়ি। শুনে আমি বলেছিলাম আমাদের দুজনকে তোদের সঙ্গে ধরে নিস।

ফেরার সময় চৌমাথা থেকে বাঁদিকে বাড়ির পথে ঢুকতে যাবার কিছুটা আগেই চোখের সামনে সাংঘাতিক একটা দুর্ঘটনা ঘটল। কেশব জেঠুর বড় ছেলে মোটরসাইকেল নিয়ে আসছিল। পিছন থেকে অন্য একটা মোটর সাইকেল বেপরোয়া গতিতে এসে ধাক্কা মেরেই রাস্তার উল্টো দিকে ছিটকে পড়ল। সেই ছেলেটা স্পট ডেড। কোনও রকমে সুবীরদা প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। তবে অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। পাড়ার ছেলেরা ধারে কাছেই ছিল। সবাই ছুটে এসেছে।

ওরাই আমাকে ছাড়ল না, বলল তোমাকে যেতেই হবে। আমরা সুবীরদাকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে এই সবে ফিরছি। ৭২ ঘন্টা সময় দিয়েছে। কি হবে বলতে পারছি না।

হাসপাতালে যাবার সময় রাস্তার মোড়ে স্কুটারটা রেখে বিকাশকে বলে গিয়েছিলাম এগুলো তোমার কাছে পৌঁছে দিতে।

এদিকে ওদের পিকনিকের সব কিছু কেনাকাটা হয়ে গিয়েছে, রান্না শুরু হয়ে গিয়েছে তারপর এই বিপত্তি। বিকাশরা কজন বাদে বাকি সবাই হাসপাতালে গিয়েছিল, তাই ওরা তোমাকে ডাকতে আসতে পারেনি। পুরো পাড়াটাই এখন থমথমে।

কেশব জেঠুদের বাড়ির গায়েই ননীদের বাড়ি। আসার সময় বিকাশদের বলে এলাম তোরা সব খাবার দাবার নিয়ে আমাদের এখানে চলে আয়। ওখনে হৈ-হল্লা করাটা ঠিক হবে না। ওরা এখনই এসে যাবে।

কমলিকা বলে তাহলে আমি শাড়িটা ছেড়ে অন্য শাড়ি পরে আসছি। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এসো। মনে মনে কমলিকা মা দুগ্গাকে স্মরণ করল 'মাগো কি করতে গিয়ে কী হয়ে যাচ্ছিল, ক্ষমা করো মাগো'...

ডেকচি কড়াই, খাবার-দাবার নিয়ে পাড়ার দলবল এসে হাজির। মন্টু বলল বৌদি শাড়িটা পরে তোমাকে একদম একঘর লাগছে। তবে, চোখ-মুখ ফোলা ফোলা লাগছে কেন গো? ফিরতে দেরি দেখে দাদার জন্যে খুব কেঁদেছো নাকি!

কমলিকা বলে এবার কিন্তু মার খাবি। সবসময় ফাজলামি, নাঃ!

ননী বলল বিকাশের কাছে যখন শুনলাম রঞ্জনদার ব্যাগে একবাঞ্চ গোলাপ আর মিষ্টির বাক্স তখনই ধরেছি আজ নিশ্চয়ই শুভদিন কিছু আছে। এত বছরে কোনওদিন তো ফুল মিষ্টি আনতে দেখিনি!

রঞ্জন বলল তাহলে সত্যি কথা বলি শোন। পরশুদিন আমাদের অফিসের সাহাদা ৩২ বছরের বিবাহবার্ষিকীর মিষ্টি খাওয়ালো। আমরা সবাই চেপে ধরলাম হঠাৎ মিষ্টি খাওয়াচ্ছো কেন? সাহাদা বলল জানো, এই প্রথম বিয়ের দিনটা আমাদের মনে পড়ল। আরে! আমাদের সময়ে তো এসব ছিলই না। মনেও পড়ত না। কাল তোমাদের বৌদি বলতে মনে পড়ল। তাই ভাবলাম তোমাদের একটু মিষ্টি মুখ করাই।

রঞ্জন বলল আজ আমাদের ২৭ বছরের বিবাহবার্ষিকী। এর আগে কোনও দিন এসব করার সুযোগ পাইনি। সাহাদার কথা শুনে কাল রাতে আমিও ঠিক করেছি আজ তোদের বৌদিকে সারপ্রাইজ দেব। আর কপাল দেখ, আজকের দিনটাতেই কেমন ঘটনা ঘটল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা চলে যাবার সময় বলল রঞ্জনদা তোমাকে চাঁদা দিতে হবে না, এবারে আমরা খাওয়ালাম। সামনের বার থেকে কিন্তু তোমাকে ছাড়ছি না। এই দিনটা আমাদের জন্যে বরাদ্দ থাকল বলে দিলাম।

সব কাজ সেরে শুতে যেতে ওদের অনেকটা রাত হল। ঘরে শুতে যাবার সময় ওরা দেখতে পায় ওই ছেলেগুলো কখন যেন চোখের আড়ালে সারা বিছানাটাতে লাল গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে।

কমলিকাকে ধরে রঞ্জন বলল সন্ধ্যেটা অশুভ হলেও আজকের বাকি রাতটুকু আমাদের জন্য শুভ হয়ে উঠুক।

কমলিকা চুপ করে রঞ্জনের সব আদরটুকু উপভোগ করতে করতে বলল শাড়িটা খুব সুন্দর হয়েছে গো। সবাই বলে লাল শাড়ী আমার অঙ্গের শোভা। লাল রঙ আমার জীবনের সঙ্গী।

রঞ্জন বলল সে তো হবেই। তবে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমি তোমার সব কথা শুনেছি। আমার একটু ভুল হয়েছে। বাড়িতে ফিরে তোমাকে বলে গেলেই হত। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে নষ্ট করার মতো একটুও সময় ছিল না।

তুমি জানো রঞ্জন মানে আনন্দদায়ক, রঞ্জন মানে সন্তুষ্টি, রঞ্জন মানে লাল রঙে রঙীন। আর ভালোবাসার রঙটাও তো লাল! তার কখনও মৃত্যু হয় না। আমি সবসময় তোমার সঙ্গে থেকেই যাবো।

অনেক বছর পর নতুন করে ভালোবাসার আলিঙ্গনে গোলাপের পাপড়ি বিছানো শয্যায় কখন যেন দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

(সমাপ্ত)

(গতসংখ্যায় লেখিকার নাম অনাবধনতা বশতঃ শ্রাবণী না হয়ে সর্বাণী ছাপা হয়েছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত)

রঙের পথে পথে

পর্ব ৩

সনৎ চক্রবর্তী

আপনি চা খেয়ে, তার তলানি ফেলেন। পড়ে পড়ে দেওয়ালে দাগ হয়েছে। অপরিচ্ছন্নতা ভীষণভাবে, তাছাড়া কোম্পানি খরচ করে চুনকাম করায়। সেই খরচটা আপনার দিতে হবে। আপনার মাইনে থেকে প্রতি মাসে কত টাকা করে কাটলে আপনার অসুবিধা হবে না। কান্নাকাটি, হাতজোড় শেষে লিখিত ক্ষমা এবং ইউনিয়ন তরফ থেকে দায়িত্ব নেওয়ায় দিবাকর ব্যানার্জী পথে এলেন। এরপর আর কোনো দিন চা খেয়ে তলানি ফেলেনি কেউ। Hoogly Ink রক্ষণশীল ব্রিটিশ কোম্পানি ছিল। ভবিষ্যত জীবনে চাকরী করতে করতে মনে হয়েছিল ভালোই ছিল অনুশাসন ও নিয়মে চলা সুখী জীবন। Hoogly Ink-এ ওভার টাইম ছিল না। পাঁচটার পর কেউ কাজ করলে জিজ্ঞাসা আসত, তোমার কাছে কাজ বেশি না, তুমি অযোগ্য? কলকাতার বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে অফিসে একবার এক ঘটনা ঘটেছিল। Sales Manager Amitava Roy মাঝে মাঝে পাঁচটার পরে অফিসে বসে কিছু কাজ করতেন। Ratkin সেটা লক্ষ করেন। একদিন এসে আলো পাখা নিভিয়ে দেন। Amitava Royকে বলেন You are wasting my electricity. Either you are over bundened or you are inefficient. Tell me the fact. Amitava Roy sorry বলে বাড়ি চলে যান। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে তিনটি কোম্পানি ছাপার কালি তৈরি করত। Hoogly, Ganges, এবং Coats. তার মধ্যে প্রথম হুগলি, আনুমানিক ১৯১৩ সালে Scotland নিবাসী মি. বারকেট পত্তন করেন। হুগলি নদীর তীরে লিলুয়াতে তাই নাম হয় Hoogly Ink Co. তার আগে বিদেশ থেকে ছাপার কালি আসত। যার মুখ্য বিক্রয়কারী ছিল John Dickenson Co. যার উদ্যোগে Hoogly Ink তৈরি হয়। পরে Hoogly Ink আর John Dickenson মিলে যায়। ১৯৭৬ সালে একজনের ছুটির বদলে কাজ করতে দিল্লি এসেছিলাম। প্রায় তিন মাস থাকতে হয়েছিল। সেই সময় L.M. Bhattacharya ছিলেন Hoogly Ink-এর Senior most salesman. লোকে তাকে গুরুজি বলত। বহুদিনের বাস দিল্লিতে। তাঁর সঙ্গে তিন মাস কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি John Dickenson যখন হুগলিতে মিশে যায় তখন হুগলিতে আসেন। ভদ্রলোক অল্প কিছুদিন পরে অবসর নেন। দিল্লির কালির বাজার তার নখদর্পণে ছিল। চাউরী বাজার সদর বাজার তাঁর বিশেষ পরিচিত জায়গা ছিল। তাঁর সাথে আগ্রা গিয়ে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। ডিলাররা তাঁকে বাড়িতে ডেকে আপ্যায়ন করত। আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর তাঁর নখদর্পণে ছিল। Hoogly Ink কালো কালির জন্য বিখ্যাত ছিল। কালো কালির বিক্রয় ছিল এক চেটিয়া যেন নিমন্ত্রিত সামগ্রী। তিন মাস পরে কলকাতায় ফিরে বুঝতে পারা গিয়েছিল। Black department এত সুরক্ষিত ও বিশাল ছিল। Black department-এর জন্য supervisor ছিলেন। ডোমজুড় থেকে রোজ সকাল সাড়ে সাতটায় আসতেন। ট্রেন করে সহকর্মীরা ঠাট্টা করে বলত উনি শোবার আগে গায়ে তেল মেখে শুতেন। সকালে স্নানে কম

সময় লাগতো। তাতে তিনি মজা পেতেন। সুশীল চক্রবর্তী খুবই হাসিখুশি এবং কর্মঠ লোক ছিলেন। বলতেন সারা ভারতে আমার তৈরি কালি যায়। কারণ কালো কালি তৈরি কলকাতায় কেন্দ্রীভূত ছিল। এখানে অন্যান্য শাখায় যেত, তারা বিক্রি করত। তার কারণ একটা পদ্ধতিতে তৈরি মিশ্রণ হত এবং আশ্চর্য কথা এতে যে জল ব্যবহার হত সেই জল পরে বেরিয়ে যেত। পরে Dr. Mullick বুঝিয়ে ছিলেন। সেই অভূতপূর্ব পদ্ধতি নাকি Barket সাহেব বিলেত থেকে এনেছিলেন। আসলে এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা অনেকের জানা ছিল না।

Hoogly Ink-এর কিছু গ্রাহক ছিল যেগুলো নামী এবং তাদের কেনার পরিমাণ অনেক বেশি হত। তার মধ্যে ITC এবং নাসিকের Security Ink আর New Currency Press যার জন্য খোলা বাজারে Hoogly Ink কালি কম বিক্রি হত। কালো কালি ছাড়া K.K. কিন্তু চাইতেন হুগলি অন্যান্য কালি তৈরি করুক। Dr. Mullick এবং আমি সেজন্য Silk Screen এবং Ink Printink কালি তৈরি আরম্ভ করি। এই কাজে আমরা সফলও হয়েছিলাম। আগেই জানিয়েছিলাম ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে অনেক কিছু করা হত বা করতে দেওয়া হত না। প্রদীপ দত্তগুপ্তর আশা ছিল Breez চলে যাবার পর Technical Manager সেই হবে। কিন্তু তা হয়নি তার কারণ Dr. Mullick তাঁর চেয়ে অনেক শিক্ষিত ও অনেক অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই নিয়ে ওনাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। K.K. চাইতেন Hoogly Ink বাজারে প্রতিপত্তি দেখাক। কিন্তু এই নানা কারণে তা হতো না। তখনকার হাওয়া অনুযায়ী Hoogly Ink-এ দুটো ইউনিয়ন ছিল। একটি বাম প্রভাবিত আর একটি দক্ষিণ প্রভাবিত। বাম প্রভাবিত ইউনিয়নে অফিস কর্মচারী এবং অনেক শ্রমিক ছিলেন। আর দক্ষিণ প্রভাবিত ইউনিয়নে মূলত অবাঙালি শ্রমিকরা ছিলেন। K.K. তে মূলত অবাঙালি শ্রমিকরা ছিলেন। K.K.-একটু ডানদিকে ঝোঁকা ছিলেন।

Close Cover Staff বলে একটা ব্যবস্থা ছিল। সারা ভারতে জনা পঁচিশ স্টাফ ছিলেন। এঁরা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারে মাইনে পেতেন। Chatered Bank-এ তাদের A/c হত। মাসের ২৫ তারিখে তারা খামে ভরা রসিদ পেত, প্রাপ্তি স্বীকার করে সেটা পাঠাতে হত। সমস্ত Technical Stuff, Managerরা এই Close Cover Staff-এর মধ্যে পড়তেন। আশ্চর্যের বিষয় তাদের Salary Head Office থেকে যেত। কাজেই সেই কারণে আমি Close Cover Staff ছিলাম। Close Cover Staff কে অন্য কর্মচারীরা Adminstrasion-এর লোক ভাবত। যাইহোক Hoogly Ink শান্তির সংগঠন ছিল। আর উন্নতি সাধারণ ভাবে তখনকার হিসাবে ঠিক ছিল। লোকের মধ্যে হাসি ঠাট্টা ছিল এবং হৃদ্যতা ছিল। সকাল বিকাল চা পাওয়া যেত একটাকা পনেরো পয়সার খাবারের কুপন পাওয়া সেই পয়সায় খাবার খাওয়া যেত। দুজন খাবার ওয়ালা খাবার নিয়ে আসত আর দুটো হোটেল বাইরে ছিল তাতে ভাত ডাল পাওয়া যেত।

Dr. Mullick খাদ্যরসিক লোক ছিলেন। প্রায়ই খাবারওয়ালার থেকে কচুরী সিঙ্গাড়া খেতেন খাওয়াতেন। এমন কি লাঞ্চেতে বাইরেও নিয়ে যেতেন খেতে। একবার বললেন রবিবার একটু আসতে পারবেন? কয়েকটা কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। রোববার এসে গেলাম। কাজ তো যেমন তেমন ও দুপুরে বাইরে খেতে যাওয়া। B.T. Road-এর ধারে গঙ্গার তীরে এক পাঞ্জাবী ধাবায় চারপায়ীতে বসে একা রুটি মাংস আর লস্যি খাওয়া। তাও আবার অন্যদের না বলার পরামর্শ। এরকম আরো দু একবার হয়েছিল পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে খাওয়া। কিন্তু অসুস্থতার কারণে ডাক্তারের নির্দেশে সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি থেকে আনা ডাল ভাত বরাদ্দ হল। আমরা সবাই অবশ্য বাড়ি থেকে খাবার আনতাম। কুপনের পয়সায় বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যেতাম বা ওখানে বসে চা সিঙ্গাড়া চপ খেতাম। কলকাতার Head Office-এ সাঙ্গুভেলী থেকে খাবার আসত। Madras থেকে বদলী হয়ে এলেন স্বপন ভট্টাচার্য। পাঁচ বছর পরে নিয়ম অনুযায়ী কলকাতায় এলেন। গুরুদাস চক্রবর্তীর যাওয়ার কথা। প্রশাসনিক কারণে গুরুদাসের যাওয়া হল না। স্থানীয় লোক ওখানে ভর্তি হল। প্রদীপ দত্তগুপ্ত, গুরুদাস চক্রবর্তী, সমরেশ দত্ত তিন কেমিস্টের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বপন ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রদীপ বাবুর বনিবনা হত

না। কাজেই Technical Department দুটো গ্রুপ হয়ে গেল। একটাতে প্রদীপ, গুরুদাস, সমরেশ আর একটায় Dr. Mullick, স্বপন, আর আমি। Technical Departmentকে লোকে T/D বলে জানত। কে. কে. কিন্তু ড. মল্লিকের পক্ষে প্রয়োজনে ঝুঁকতেন। মাঝে মাঝে কলকাতার অফিসে যাওয়া থাকত। ড. মল্লিকের সঙ্গে কে.কে. মান্থলি মিটিং করতেন Close Cover Staff আর States Department-এর সঙ্গে। সেখানে কাজের পর্যালোচনা হত। সকলকে নিজের নিজের সুবিধা অসুবিধা ও ভবিষ্যত যোজনা সম্পর্কে বিবরণ দিতে হত। প্রথমদিকে Dr. Mullick নিজেই করতেন। ধীরে ধীরে আমাকেও তার সহযোগী হিসাবে প্রাধান্য দিতে লাগলেন। ক্রমে আমি Dr. Mullick এর ছায়া হয়ে গেলাম। Dr. Mullick আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমিও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম। এর ফলে কোম্পানীর মধ্যে আমার একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলত চামচা, কেউ বলত খবরকারী। কিন্তু সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল এবং সকলেই ভালোবাসত। Weighing Department-এর হরি গাঙ্গুলী সুযোগ পেলেই ব্যক্তি পারিবারিক গল্প করতেন। বামপন্থী Union-এর সবাইয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। তাদের সম্পাদক সুকুমার চৌধুরী এবং অন্যান্যরা আমাকে ভালো বন্ধু ভাবত। কিন্তু একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলত। Hoogly Ink Employers' Cooperetive Bank ছিল। তাতে মাসিক কুড়ি টাকা জমা করত সবাই। প্রয়োজন হলে দু হাজার টাকা পর্যন্ত লোন পাওয়া যেত। ওরা আমাকে তার সভ্য করে নিয়েছিল। অন্যলোকের প্রয়োজনে আমি দু একবার গ্যারান্টারও হয়েছিলাম। Stores-এর সৌরেন মল্লিক সমসাময়িক লোক ছিল। Raw Material Testing করাতাম বলে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব বেশি ছিল। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী মল্লিক আমাকে Stores-এর কিছু কাজও শিখিয়েছিল। যেমন In coming Out going list তৈরি, Monthly Purchase ও Present Balance। পরবর্তী জীবনে মল্লিকের শেখানো কাজ খুব উপকারে এসেছিল। দু এক মাসের মধ্যে Hoogly Ink-এর জীবন বেশ আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। Raw Material Testing-এর কাজ বেশি না থাকায় Works Manager-এর আগ্রহে Daily Quality Control-এ কাজ করতে হত। সেই সূত্রে সমস্ত মেশিনম্যানও প্রোডাকশন সুপারভাইসর সুকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল। সুকুমার ভট্টাচার্য কবিতা লিখতেন। শুকতারা পত্রিকায় ওর কবিতা প্রকাশ হত। সঙ্গীত অনুরাগী বলে Dr. Mullick ওকে ভালোবাসতেন। কালির কাজে Colour Matching একটা বিশেষ কাজ। Dr. Mullick চাইতেন আমি ওই কাজটাও করি। যে কারণে Sales থেকে Ink Printing Matching আমার নামে আসত।

এইভাবে ছ মাস প্রায় কাটল। দিল্লি থেকে খবর এল মলয় নাথ ছুটি নেবেন। নিয়ম অনুযায়ী কোনো কেমিস্ট মানে ক্লোজ কভার স্টাফ তার জায়গায় যাবেন এবং এক মাস কাজ করবেন। সবাই একবার করে গেছেন। নানান অসুবিধার কথাও ও জোর আপত্তির পর কে.কে. সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে পাঠানো হবে। ড. মল্লিক একদিন দুপুরে লাঞ্চের সময় বললেন। আপনাকে এক মাসের জন্য দিল্লি যেতে হবে। আমি মনে মনে খুশি হলাম। কিন্তু প্রকাশ করলাম না। কারণ অন্যান্য অনেকের, আমি নতুন বলে আপত্তির সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া তখনও আমার probation period চলছিল। সেবারে দুর্গাপূজা তাড়াতাড়ি ছিল। ড. মল্লিক একদিন একটা টিকিট এনে বললেন পূজার একদিন বাদে বেরিয়ে পড়ুন। ঠিক সময়ে টিকিট এল। ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭৬ কালকা মেল দিল্লি যাত্রা। স্টেশন বন্ধুরা এল পৌঁছে দিতে। হুগলি ইঙ্ক-এ নতুন বলে আমার পরিচিতি ছিল না। কে.কে. আমার একটা ছবি মি. নাথকে পাঠিয়েছিলেন। যাতে আমাকে চিনতে অসুবিধা না হয়। মি. নাথ বলেছিলেন আমি যেন ট্রেন থেকে নেমে কামরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। সেই মতো দিল্লি পৌঁছে নাথদার কথা মতো কামরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আলো ঝলমল দিল্লি একটু ভয় ভয় করছিল। নাথদা কিন্তু বিনা দ্বিধায় আমায় খুঁজে নিল। বিশালকায় এক ভদ্রলোক হঠাৎ এসে বললেন আপনি তো। আমি বললাম হ্যাঁ আমি। হাতে কিন্তু আমার ছবিটা ছিল। নাথদা একবার মিলিয়ে নিয়েছিল।

কে.কে-র ব্যবস্থা অনুযায়ী আমায় হোটেল বা

লজে রাখা হয়নি। লোনি ফ্যাক্টরির কাছাকাছি বলে আমার থাকার বন্দোবস্ত শাহাদরায় এক বাঙালি ছেলের সাথে করা হয়েছিল। সবই অবশ্য নাথদার পরিকল্পনা। হাল্কা শীতের মাঝে রাত নটা নাগাদ এক জায়গায় পৌঁছালাম। নীলরতন ভঞ্জ। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া শিবপুরের ছেলে সমবয়সী নাথদা এবং ভঞ্জ দুজনেই খুব গম্ভীর গোছের লোক ছিল। পরে অবশ্য হৃদ্যতা খুব বেশি মাত্রায় হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন রাতে নাথদার বাড়িতেই খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নাথদা চলে গেলেন। হাত পা ধোয়ার পর ভঞ্জ আমাকে নিয়ে নাথদার বাড়ি এল। নাথদার স্ত্রী মুরগীর ঝোল আর ভাত খাওয়ালেন। সাথে পায়েস। আরো অনেকে ছিল। শিশির ঘোষ তার স্ত্রী বুলবুল, বিমান ধর ইত্যাদি। বুলবুল বরানগরে সিঁথির মেয়ে ফলে সম্পর্কটা আলাপটা ভালো জমলো। রাতে ভঞ্জর বাড়ি ফিরে চারপাইতে ঘুমোন। নতুন অভিজ্ঞতা। প্রথম দিকে ঘুম না এলেও পরে গভীর ঘুম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ভঞ্জ রান্না শুরু করল আমায় সাহায্য করতে বলল। সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম। ভঞ্জর লাভ হয়েছিল কিনা জানি না। নাথদা Hoogly Ink Factory নিয়ে গেলেন। লোনি গাজিয়াবাদে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। সবাই হিন্দিভাষী। নাথদা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর এক মাস ছুটিতে আমি কাজ করব। ওরা ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত। কারণ নাথদা লম্বা ছুটিতে গেলে কলকাতা থেকে কেউ আসে। এটাই নিয়ম, যাইহোক কাজ তো একই শুধু ভাষাটাই সমস্যা। এরপর নাথদা আমায় নিয়ে দিল্লি অফিস এলেন।

দিল্লি অফিসে অবশ্য ভাষার সমস্যা কম ছিল। দু একজন ছাড়া সবাই ইংরেজি বলত বুঝত। ব্রাঞ্চ ম্যানাজার দীপক রায় প্রবাসী বাঙালি। বাংলা বলতেন ও বুঝতেন। দিল্লি অফিসের লোকেরা খুবই ভালো ছিল। মাথুর, শেঠ, মেহেরেত্রা, শর্মাজি খুবই সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। যাক আমার কাজ তো লোনি ফ্যাক্টরিতে, কাজেই সব ঠিক মতো চলতে লাগল। সিনিয়র সেল্‌স ম্যানেজার এল.এম. ভট্টাচার্য আমাকে স্নেহ করতেন। লোনি ফ্যাক্টরীতে প্রোডাকশন সুপারভাইসর মদনলাল লোহরা খুবই কাজের লোক ছিল। আমাকে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতেই দেয়নি। Sales Department-এর লোকেদের সঙ্গে কাজ করে কিছু Tin Printing Ink তৈরি করে দিয়েছিলাম। সেটা আগ্রা ও কানপুরে পাঠিয়ে উৎসাহজনক খবর পাওয়া গিয়েছিল। দীপক রায় ও অন্য সবাই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল।

আমার দিল্লি একমাস থাকার কথা সেটা বেড়ে তিন মাস হয়ে গিয়েছিল। নাথদা ফেরার পরেও আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। ওই সময় সাধারণত সেল্‌স ম্যানদের সাথে মার্কেটে যাতায়াত করতাম। হুগলি ইঙ্ক ব্ল্যাক কালির জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বাজারে তখন রঙীন কালির চাহিদা বাড়ছিল। লেটার প্রেস থেকে অফসেট কালি চাহিদা এসে গিয়েছিল। সে ব্যাপারে দিল্লি হুগলি বেগ পেয়েছিল। পুরোনো গ্রাহকরা চাইছিল নিয়মিত কালো কালি ছাড়া হুগলি ইঙ্ক কালার অফসেট কালি তৈরি করুক। দু এক জায়গায় ভালো ফলও পাওয়া গিয়েছিল। নাথদা অবশ্য মনে মনে খুব একটা পছন্দ করত না। নাথদা প্রথাগত কালো কালি নিয়ে এবং কিছু সস্তার রঙীন কালির মধ্যে ব্যস্ত থাকা পছন্দ করত। মুখে অবশ্য আপত্তি করতেন না।

প্রবীণ সেল্‌স ম্যান এল.এম. ভট্টাচার্য আমাকে নিয়ে আগ্রা ট্যুর করতে চাইলেন। দীপক রায় মানা করলেন না। কালী পূজার পরে, দুদিন আগ্রা ঘুরে এলাম। আগ্রাতে হুগলি ইঙ্ক-এর তিনটি ডিলার ছিল। M/s R.D. P.L., Gupta Traders আর Narendra & Co. নতুন হলেও উৎসাহ নিয়ে কাজ করত। লালমোহন বাবু তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। সারা দিন কাজের পর তার বাড়িতে রাতে থাকতেন। আমার একটু খারাপ লাগলেও চুপ করে ছিলাম। কারণ বাজারে তাঁর নাম ডাক বেশ ভালোই লাগছিল এবং অনেক টাকার অর্ডার ও পেমেন্ট আনার ভাগীদার হয়েছিলাম। কাজের ফাঁকে প্রচুর বেড়ানো আর খাওয়াও হয়েছিল। তাজমহল, আগ্রা দূর্গ, ফতেহপুর সিক্রী দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। নাথদা ছুটির থেকে ফিরে আসার পর আমার কাজ অনেক কমে গিয়েছিল কার্যত সেল্‌সদের সঙ্গে Customer visit আর একুট আধটু নতুন matching ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। তারপর প্রচন্ড ঠান্ডাতে কষ্ট হচ্ছিল। কাজেই ফিরে

আসাই ঠিক করলাম। দীপক রায়কে বলে ফেরার ব্যবস্থা করলাম। ফেরার আগে শিশির ঘোষ আর তার স্ত্রীর সাথে ঘুরে কিছু শীতের কাপড় জামা এবং ঘর সাজানোর জিনিস কিনেছিলাম। গিয়েছিলাম এক মাসের জন্য থেকে এলাম তিন মাস। কোম্পানী অবশ্য আমাকে দিল্লিতে স্থায়ীভাবে থাকতে বলেছিল। কারণ কে.কে. মি. নাথকে ফেরত আনতে চাইছিলেন। আমি খুব একটা অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে আপত্তি করলেন না। ১৯৭৭ জানুয়ারীর শুরুতে কলকাতা ফিরে এলাম। দুচার দিন খুব গল্প হাসি আর আড্ডার মধ্যে কাটল।

ধীরে ধীরে আবার নিয়মিত কাজ। হুগলি ইঙ্ক-এ Madras Branch-এ মি. সুব্রমনিয়াম ম্যানেজার ছিলেন. বর্ষীয়ান পেশাদার অত্যন্ত ভদ্রলোক বহুদিন Calcutta Manager ছিলেন। Retire করে দেশে ফিরে যান। ওখানে তামবারামে বাড়ি করে অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন। Madras Manager চাকরী ছাড়ায় Group Captain Mukherjee-এ অনুরোধে আবার Marass Branch-এর দায়িত্ব নেন। Group Captain Mukherjee এককালে MD Harry Ratkin-এর পি.এ. ছিলেন। ভারতবর্ষের আইন অনুযায়ী তাঁর এদেশে থাকার সীমিত সময় ছিল। কারণ তখনকার নিয়ম অনুযায়ী বিদেশি পুঁজি ষাট ভাগ থাকতে পারত বাকি চল্লিশ ভাগ দেশি ছিল। সেই কারণে নিতাই দত্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। সেই কারণে Ratkinকে প্রতি বছর কিছুদিন দেশে ফিরে যেতে হত। Ratkin Indian Citizenship নেননি। আর সেই কারণে তাঁর পি.এ-কে এম.ডি. করেছিলেন। তাঁর প্রতিনধি হিসাবে। গ্রুপ ক্যাপ্টেন মুখার্জী এম.ডি হলেও ক্ষমতার কেন্দ্র কিন্তু কে.কে. ছিলেন। কারণ কে.কে. অভিজ্ঞ আর চৌখস ছিলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন মুখার্জি বাকি জীবনটা ভোগ করে আরাম কেদারায় কাটাতে চাইতেন। এয়ার ফোর্সের রিটায়ার্ড লোক ছিলেন সরকারি পেনশনে আর হুগলি ইঙ্ক-এর বাড়ি গাড়ি মাইনেতে ভালোই কাটাচ্ছিলেন।

যাইহোক Madras থেকে নানা complain আসছিল, নতুন কেমিস্ট শ্রীধরণ সামলাতে পারছিল না। কে.কে. বললেন আমাকে এক মাসের জন্য যেতে। ড. মল্লিক সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। সেই সময় একটা নতুন গাড়ি (Ambassadar) Madras যাচ্ছিল। কে.কে. বললেন গাড়িতে যাও নানা শহর বেড়াতে বেড়াতে পৌছে যাবে। ব্যবস্থা মতো গাড়ি করে Madras রওনা হলাম। চারদিন পরে Madras পৌঁছালাম। পথে কটক, ভাইজাগ ও ভেলোরে রাত কাটিয়ে ছিলাম। পথে শ্রীকাকুলামে পেট্রোল ফুরিয়েছিল। অনেক খোঁজার পর পাওয়া গিয়েছিল। বাকি রাস্তা নির্বিঘ্নে কেটেছিল। Madras-তে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল Hotel Dashaprakash। Hoogly Ink factory ছিল তামবারাম জি.টি. রোড। ছোট হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার যাওয়ার দুদিন পর কে.কে. মাদ্রাস এসেছিলেন। কোনো একটা কাজে আর একমাস কি কাজ করব তার একটা বিবরণ পেতে ও পরামর্শ দিতে। কে.কে. Taj Coromondal-তে থাকতেন। দুদিন সন্ধ্যাবেলা কে.কে. ডিনার করতে ডেকেছিলেন। তখন Chepauk Stadium-তে ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড খেলা হয়েছিল। বিষণ সিং বেদী তার টীম নিয়ে ওই হোটেলে ছিলেন। একবার তাঁদের দেখেছিলাম। কে.কে. চলে এলেন। আমি থেকে গেলাম। সুব্রমনিয়াম বাংলা বলতে পারতেন। কারণ অনেক দিন কলকাতায় ছিলেন। তাঁর সাথে ভালোই কাজ হয়েছিল। কে.কে.-র উপদেশ মতো প্রথমে গ্রাহকদের কাছে গিয়ে তাদের অসুবিধাগুলো শোনা হয়েছিল। তারপরে যেগুলো ব্যবসায়িক সমস্যা সেগুলো আলাদা করা হয়েছিল। আর যেগুলো প্রযুক্তিগত সমস্যা সেগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে **সমাধান** করা হয়েছিল এবং গ্রাহককে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে কলকাতা থেকে পরবর্তী মাল আসবে তা গ্রাহকের পছন্দ মতো এবং প্রযুক্তিগত সমস্যা ব্যতিরেকে আসবে। তাতে গ্রাহকের বিশ্বাস বা আস্থা ফিরে পাওয়া গিয়েছিল। আসল সমস্যা ছিল যোগাযোগ ও after sales service, সেটা বিভিন্ন কারণে কম হয়ে গিয়েছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকা বেঙ্গালোর এবং পণ্ডিচেরীতে গিয়েও এভাবে কাজ করা হয়েছিল। সুব্রমনিয়াম সাহেব খুব খুশি হয়ছিলেন। কে.কে-র কাছে আমার প্রশংসা করেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আশ্বাস

শিপ্রা অধিকারী

আমি একজন ভবঘুরে। আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী একটা মান্ধাতা আমলের বড়সড় ডায়েরী। আর বেশ কয়েকটি পেন। বেশ কয়েকটা এই জন্যই যখন একটা শেষ হয়ে যায়, সেটা ফেলে দিয়ে অন্যটা ধরি। ও হরি, এ কথা বুঝি বলিনি, ভবঘুরে আমি ডায়েরী আর পেন দিয়ে কি করি? আরে কথায় আছে না, রতনে রতন চেনে। আমি নিজে ভবঘুরে, তাই পথে ঘাটে, হাটে বাজারে যেখানে কোনো উদাসীন লোক দেখতে পাই, মনে হয় তার উদাসীনতার পিছনে কোনো গল্প আছে, তার সঙ্গে মিলে যাই। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে, কিসের আগ্রহে তারা ঘরকে করেছে পথ, পথকে করেছে ঘর। এইভাবে কত যে মানুষের কত রকমের ঘরছাড়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি আমি নিজেই জানি না। কবে থেকে যে এ আহরণ শুরু হয়েছিল, তা-ও আজ মনে পড়ে না। আজ এই মুহূর্তে এক সাধু মানুষের কাহিনী শেষ করে দেখি, ডায়েরিতে আর মাত্র ক'টা পাতা বাকী আছে। আরে কবে এর এতগুলো পাতা শেষ হয়ে গেল? এতে কত জনের জীবনকাহিনী আছে? সেগুলোর বিষয় বস্তু কি? কিছুই তো পড়ে দেখা হয়নি। শুধুমাত্র কৌতূহল বশে লিখেই গেছি।

রাস্তার ধারে একটা ফুটপাথে একটুখানি জায়গা দেখতে পেয়ে, ওখানই বসে পড়লাম। চোখ বোজা অবস্থাতেই ডায়েরীর মাঝখান থেকে একটা পাতা খুললাম। অন্ধকারের ওপার থেকে একজনের এক অজানা কাহিনী বেরিয়ে পড়ল।

সে ছিল একা এক সদ্য ইয়ংম্যান। নাম ছিল তার কবীর। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শ্মশানঘাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে। গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ির ওপর সে উদাসীন হয়ে শূণ্য চোখে অদূরে এক মানুষের জটলার দিকে তাকিয়েছিল। কেমন করে যেন আমি ওর মনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মনে মনে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমি এক জন্ম ভবঘুরে। আরেক উদাসীনকে দেখে তাকে বন্ধু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলাম না। কোথায় যেন পড়েছিলাম, বন্ধুত্ব তখনই শুরু হয়, যখন দুজনের মনের ভাবনা এক হয়ে যায়। পাশে বসে ধীরে ধীরে এটা সেটা কথার পর, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। অন্ধকার হয়ে এল, তুমি এখনও এখানে বসে আছে, ঘরে যাবে না? তোমার ঘর কত দূরে? প্রথমে, সে কোনো জবাব দিল না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমার ঘর আছে, আবার নেই।' আমার নীরব উৎসুক কৌতুহল মেটাতে এবার সে বলল, 'আমি আর আমার মা থাকতাম। আমাদের আত্মীয়-স্বজন যথেষ্ট আছেন এবং তারা সকলেই ভালো লোক। সকলেই পয়সাওলা। মায়ের অসুখে তারা অনেক সাহায্য করেছেন। চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছেন। এমন কি মায়ের অন্তিম কাজেও অর্থ দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এ-ও বলেছেন, আমাকে কোনো একটা কাজ জুটিয়ে দেবেন, যাতে আমার ভবিষ্যৎ জীবন সুরক্ষিত হয়। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'তবে? তোমার তো পুরো হিল্লে হয়েই গেল। আর কি চাই?' আমার এই কথায় কবীরের

অদ্ভুত এক দৃষ্টি আমার মুখের ওপর পড়ল। ক্লান্ত হেসে বলল, 'তুমি হয়তো ঠিক বলেছো। কিন্তু আমি তো বড় লোকের কোন রকম করুণা ভিক্ষা চাইনি। চেয়েছিলাম শুধু একজন বন্ধু। সে আমার মায়ের অসুখের সময় আমার সাথে সাথে সারা রাত হসপিটালের বেঞ্চে কাটাবে। ডাক্তার ওষুধ আনতে বললে ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন আমাকে বসিয়ে রেখে নিজে ওষুধ আনতে দৌড়বে। আমার অজান্তে প্রয়োজনে নিজের পকেট থেকে টাকা বার করবে। যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষের, মায়ের, অন্তিম যাত্রায় রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গে শ্মশানযাত্রী হবে। চিতার শেষ আগুনটুকু নিভে যাওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে। তারপর সবকিছু মিটে যাবার পর চোখের জল মুছিয়ে জড়িয়ে ধরে বলবে - 'মা কি সকলের সারাজীবন থাকে? কাল ছিলেন, আজ নেই, তো কি হয়েছে? বুদ্ধুরাম আমি তো আছি।'

কাহিনীটি পড়ার পর কবীরের এই বন্ধু চাওয়ার আকাঙ্খা আমাকে বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। একজন মানুষের জীবনে একটু বন্ধুত্ব এত দামী যে সকল পাওয়ার উপরেও তা পাওয়ার আকাঙক্ষা রয়ে যায়। এমন কি আশ্বাস থাকেওই দুটো কথার মধ্যে, 'বুদ্ধুরাম, আমি তো আছি' — শোনার জন্য মন এমন হাহাকার করে? এ বন্ধু কে? কোনো বিশেষ মানুষ, না মানুষরূপী ঈশ্বর? না কি আপন অন্তরাত্মা? কি জানি, এর জবাব কি।

মনে মনে কতক্ষণ ওই গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ির ওপর বসে থাকা বন্ধুহীন মানুষটির সঙ্গে ছিলাম, খেয়াল নেই। রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের আলো জ্বলে উঠতে দেখে মন বাস্তবে ফিরে এল। বন্ধুত্বের ভাবনায় নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার বড় আওয়াজ, বড় বেশি লোক চলাচল। এত কোলাহলে সবকিছু কেমন হারিয়ে যায়। আমিও অন্য আরেক জনের কাহিনী পড়ার আগ্রহে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। গাড়ির আওয়াজ মানুষের কোলাহল সবকিছু আড়াল করতে পার্কের ভিতর ঢুকে আলোর নীচে এক বেঞ্চে এসে বসলাম।

বন্ধ ডায়েরীর একটা অংশ হঠাৎ আবার খুলে ফেললাম। সেই পাতায় দেখলাম চল্লিশোর্ধ এক তরুণ এই রকমই কোনো একটা পার্কে বসে আছে। গায়ের কোটটা যেমন তেমন করে পাশে রাখা। গলার টাই আধা খোলা। চুল অবিন্যস্ত। ক্লান্ত সুখের চেহারায় কেমন একটা হতাশ হতাশ ভঙ্গী। তাকে দেখেই বুঝেছিলাম তার এই মানসিক অবস্থার পিছনে কোনো একটা গল্প নিশ্চয়ই আছে। অতি সাবধানে তার পাশে গিয়ে বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে তাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম এই অন্ধকারে এতক্ষণ ধরে বসে আছেন। ঘরে ফেরার তাড়া নেই বুঝি? মানুষটি কেমন যেন শুন্য চোখে আমাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখলো। কোনো কথা বলল না। আমারও কোনো তাড়া ছিল না। আমিও উত্তরের আশায় চুপ করে বসে রইলাম।

একটু সময় পর সে নিজে থেকেই বলল, 'আমার ঘর আছে, আবার নেই।' চমকে গেলাম ও বাবা, ও যে একই সুর, একই শব্দ। তার মানে এ-ও বোধহয় কোনো প্রকৃত বন্ধুর অপেক্ষায় এত অবিন্যস্ত। অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন সে নিজের থেকে মনের দরজা খুলবে। এক সময় সে শান্ত স্বরে বলল, 'জানো, আমি এতদিনে স্পষ্ট করে বুঝেছি, কেউ কারোর কথা ভাবে না। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। অফিসে বস নিজেকে ভগবান মনে করেন। তিনি ঠিক বেঠিক যাই-ই করুন না কেন, মুখ বুজে সব মেনে নিতে হবে। বেঠিক কাজের কোনো ভুল ধরানো চলবে না। ঘরের মানুষগুলো যে যার মত আমার থেকে আশা করে, সেইমতো তাদের মন জুগিয়ে চলতে চলতে হবে, প্রতিবাদ করা চলবে না। অফিসে, ঘরে পাড়ায় যেখানেই ভুলে ভরা কোনো কাজের প্রতিবাদ করবে, তখনই লেগে যাবে গণ্ডগোল, কিন্তু বল, সব মানুষেরই তো সহ্যে একটা সীমা থাকে। ঠিক সেই সময় সেই stressful সময়ে যখন মাথা ঠিক রাখা যায় না, তখন যদি একজন বন্ধু পাশে থাকত। সেই বন্ধু তখন সব কিছু শুনে প্রথমে আমাকেই বকতো। বলত বেশ হয়েছে কেন গেছিলি প্রতিবাদ করতে? কিছু পরে আবার সে-ই আমার সকল ভুলগুলি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলত যা করেছিস বেশ করেছিস। অফিসে সে বস্ বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? তোর বুঝি কোনো নিজস্বতা নেই। একটু থেমে আবার বলত, দূর পাগল

যা হয়ে গেছে তা মন থেকে যেতে দে। আমি তো আছি।'

মনের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই এক কথা, একটুখানি আশ্বাস। প্রকৃত বন্ধুত্ব এত দামী? যা সকল পাওয়ার পরেও যা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায়। কোনো একটা গাড়ির তীব্র হর্ণের আওয়াজে মন বাস্তবে ফিরে এল। মনে পড়ল,

In stressful moment
when you lose your temper
over something insignificant
that's when you need a friend
some one who has been there
knows what you are going through.

সত্যি কবিরা যে কেমন করে সকলের মনের কথা দু'চার লাইনে বলে দেন, ভাবলে অবাক লাগে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত যত জনের কাহিনী পড়লাম, সকলেই প্রায় বন্ধুহীন। এই যে সাধু মহারাজের কথা লিপিবদ্ধ করলাম তাঁরও সেই একই চাওয়া। তিনি ঘর ছেড়েছেন ঈশ্বরের খোঁজে। কিন্তু আজও তিনি ঈশ্বর পাননি। তিনি ঈশ্বরও পাননি, নিশ্চিন্ত কোনো সামাজিক জীবনও পাননি। পেয়েছেন শুধু গেরুয়া রঙের পোষাক। এই পোষাকের জন্য তিনি অনেকের ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ভালোবাসাও যে পাননি তা নয়। কিন্তু নিজের কথা বলার মতো একজনও পাননি। এতে তাঁর কোনো আক্ষেপ নেই। আক্ষেপ শুধু একটাই। যদি একজন প্রকৃত বন্ধু পেতেন। যাকে তার সকল চাওয়া পাওয়ার কথাগুলি নির্বচারে বলতে পারতেন। তাহলে বেশ হত।

আজকের এই AI-র যুগে মানুষ বড়ই সীমাবদ্ধ। শুধু ইন্টারনেট, সব কিছুই অন লাইন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগও মোবাইলে। তাই দূর পাগল ভাবছিস কেন, আমি তো আছি। এটুকু আশ্বাসন বাণী শোনার জন্য ব্যাকুল মন হয়তো অনেক আছে। কিন্তু নির্ভেজাল ভাবে বলার লোক কি কেউ আছে? কে জানে হয়তো আছে। যার খোঁজ আমরা পাই না।

পাত্রী চাই

পাত্র ঃ অর্ঘ্য দত্ত

জন্ম তারিখ ঃ ৭ই জুন, ১৯৯৪

জন্ম সময় ঃ সকাল ০৫:১৫ মিঃ

বর্ণ ঃ কায়স্থ

গণ ঃ নর গণ

উচ্চতা ঃ ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ Betech in Automative and Mechanical, MBA from Kirloskar

পেশা ঃ বর্তমানে পুণেতে Automotive Consultant হিসাবে কাজ করছে

উচ্চ শিক্ষিত, কর্মরতা উপযুক্ত পাত্রী চাই।

পাত্রী চাই

নাম ঃ অঙ্কন গুহ

জন্ম তারিখ ঃ ১লা জুলাই, ১৯৮৭

জন্ম স্থান ও সময় ঃ কলকাতা, রাত্রি ০৯:৫৫ মিঃ

বর্ণ ঃ কায়স্থ

উচ্চতা ঃ ৬ ফুট

একমাত্র পুত্র

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ MA in Archaeology

পেশা ঃ বর্তমান Humayun tomb Museum-এ Admin Officer হিসেবে কর্মরত।

যোগাযোগ ঃ 9871150690

উপযুক্ত পাত্রী চাই

পাপ-পুণ্য

কালীপদ চক্রবর্তী

ট্রেনটা যখনই কোন স্টেশনে থামছে, বুধন তখনই যেন কেমন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। বুধন এর আগে বহুবার ট্রেনে চড়ে কলকাতা গেছে কিন্তু এমনটা হয়নি। জানালা দিয়ে এদিক ওদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে। মনের মধ্যে একটা ভয় কেমন যেন চাগাড় মারছে বারে বারে। নন্দ কি তাহলে মরে গেল। এতক্ষণে হয়তো খবরটা থানা পুলিশ হয়ে গেছে। পুলিশ তাহলে হয়তো এতক্ষণে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। যে করেই হোক বহুদূরে চলে যেতে হবে তাকে। কিন্তু ও তো নন্দকে মেরে ফেলতে চায়নি। সে সময় নন্দ এসে যদি ওভাবে বুধনের জামার কলারটা ধরে গালমন্দ না করত তাহলে এসব কিছুই হত না। ট্রেনের ভেতরেও কেউ ওর দিকে তাকালে মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছে বুধন। কি জানি বাবা আবার কেউ চিনে ফেলছে না তো? ভালো করে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টটা দেখে নিল, না চেনাশোনা কেউ নেই। একটু আশ্বস্ত হল। মনে মনে ভাবল হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন হয়ে গেল তখন। ও তো ইচ্ছে করে নন্দকে মারতে চায়নি।

বুধন গ্রামের চাষির ছেলে। হারাণ মন্ডলের মেয়ে শঙ্করীকে সে ভালোবাসতো। শঙ্করীর রংটা ফর্সা না হলেও ওর চোখের চাহনি, পেটা শরীরটা বুধনের মন কেড়ে নিয়েছিল। জমিদার হরকিঙ্করের ছেলে নন্দ-র কুনজর ছিল শঙ্করীর ওপর। শঙ্করীও চাইতো বুধনকে কিন্তু বাধা ছিল ওর বুড়ো বাপটা, হারান মন্ডল। হারান মন্ডল চাইতো জমিদারের ঘরের বৌ বানাতে নিজের মেয়েকে। বেশ কিছুদিন ধরে শঙ্করীর ঘর থেকে বাইরে বেরোনোও বন্ধ করে দিয়েছিল হারান মন্ডল। শঙ্করীর সাথে দেখা না হওয়াতে বুধন হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই দুপুরে হারানের অনুপস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছিল ওদের বাড়ি। শঙ্করীর সাথে একান্তে কথা বলার সুযোগও পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাধ সাধল নন্দর আবির্ভাব। বুধন শুনেছিল নন্দ আজকাল প্রায়ই শঙ্করীর সাথে দেখা করে ওকে বিয়ে করার মিথ্যা প্রস্তাব দিতে থাকে, ওর সাথে জোর জবরদস্তি করতে থাকে। সুযোগ পেলেই জড়িয়ে ধরতে চায়। শঙ্করী বুঝতে পেরেছিল নন্দর মতলব ভালো নয় তাই বুধনকে জোর দিত বিয়ে করতে বা ওকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে। সেই পরামর্শ করতেই শঙ্করী আজ ডেকে পাঠিয়েছিল বুধনকে, কারণ শুনেছিল হারান মন্ডল আজ পাশের গাঁয়ে যাবে জমিদারের কোন কাজে। এমন সময় হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হতেই দরজা খুলে বুধন দেখল, নন্দ দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। ওর মাথায় কেমন যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবুও রাগ চেপে রেখে বলল, নন্দ, তুই আবার এইচিস শঙ্করীর সাথে দেখা করতি। নন্দ আচমকাই বুধনের জামার কলারটা চেপে ধরে বলল - তুই আবার এখানে এইচিস চাষির পো, দ্যাখ, আমি এবার তুকে কেমন মজা চাখাই। এখুনি লেঠেলদের খবর দিচ্ছি। তোর হাড়গোড় সব গুঁইড়ে দেবে। বলেই শঙ্করীর হাতটা জোরে চেপে ধরে বলল - এই দ্যাখ, তুর সামনে শঙ্করীকে আমি লিয়ে যাচ্ছি, যা করার করি নে কেনে। তুর সামনে আজ আমি শঙ্করীর ইজ্জত নিয়ে ছাইরব। ইর পরও

তুই শঙ্করীকে বিহা করবি হারামজাদা।

বুধন এক ঝটকায় নন্দর হাত থেকে কলারটা ছাড়িয়ে নিয়ে রাগের মাথায় দিগবিদিকশূন্য হয়ে দরজার কপাটের খিলটা তুলে নিয়ে নন্দ-র মাথায় বসিয়ে দিল। আর সাথে সাথেই নন্দ-র দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শঙ্করী বুধনকে বলল - বুধন তুই পাইলে যা। আমি সব সামলি নেব। তুকে দেখলে উরা তুকে মেরি ফেলবে, বলতে বলতে একরকম জোর করেই বুধনকে বাইরে বের করে দিল। বুধন বাইরে বেরিয়ে ভাবল, এখানে থাকলে তো আর বাঁচা যাবে না। ওকে তো বাঁচতেই হবে শঙ্করীর জন্য। বুধন সোজা ছুটল রেল স্টেশনের দিকে। স্টেশনে গিয়ে দেখল, একটা দুরপাল্লার ট্রেন সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। বুধন কোনো কিছু না বলেই চেপে বসল ট্রেনে। পরে জানতে পারল ট্রেনটা দিল্লি যাচ্ছে। ট্রেনটার নাম দিল্লি এক্সপ্রেস। কি করবে, কোথায় নামবে কিছুই ভাবতে পারছে না। ওর তখন শুধুই একটা চিন্তা ধরা না পড়ে যায় পুলিশের হাতে। কিছুক্ষণ পর জানালার ধারের একটা সীটে কোনরকমে ভাগাভাগি করে বসে পড়ল। ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, এখন গ্রামে ফিরে যাওয়া কি ঠিক হবে। তবে কি আরও দূরে, অনেক দূরে চলে যাবে সে। ট্রেনটা স্টেশনে থামলেই ওর মনের মধ্যে দুরুদুরুভাব শুরু হতে লাগল। বুধন ভাবছিল এমনটাতো আগে কখনও হয়নি ওর। হঠাৎ মাথাটা কেমন ধরে গেছে, ভারী ভারী লাগছে। ও তো জেনেশুনে নন্দকে মারতে চায়নি। নন্দই চেয়েছিল ওর শঙ্করীকে জোর করে ওর থেকে কেড়ে নিতে। এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। পেটের খিদেটা মাঝে মাঝে চাগাড় দিয়েছে কোন রকমে জল খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই, সকালে অল্পস্বল্প কিছু কিনে খাওয়া যাবে। পকেটে হাত দিয়ে দেখল কিছু টাকা পড়ে আছে, তবে তা একদিন বা দুদিনের বেশি চলবে না। তাও ভাগ্যিস আজ ফসল বিক্রি করে টাকাটা পেয়েছিল আড়তদারের কাছ থেকে।

ট্রেনের জানালার ধারে বসে বসে বুধন স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল সেই চৈত্র মাসের চড়ক মেলার কথা। চড়ক মেলার দিন শঙ্করীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল পাশের গ্রামের চড়ক মেলায়। কতই না ঘুরেছে মেলায়। শঙ্করীকে মালা কিনে সেদিন পরিয়ে দিয়েছিল। ফুল গুঁজে দিয়েছিল ওর মাথায়। শঙ্করীর সাথে নাগরদোলায় উঠে দোল খেয়েছে দুজনে। ফেরার পথে শকুন্তলা কালীবাড়িতে গিয়ে মালা বদল করে বিয়েও করে নিয়েছিল ওরা দুজনে। শঙ্করীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল শঙ্করীকে সে কখনও ছেড়ে যাবে না। অথচ কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল। হঠাৎই যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। কত স্বপ্ন দেখেছিল শঙ্করীকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। কিন্তু সব বানচাল করে দিল হারামজাদা জমিদারের পো। এছাড়া ওর হাতে তো আর কোনও উপায়ই ছিল না। বুধন লাঠি চালনায় এতই পটু ছিল যে শঙ্করীও মজা করে বলত - তুর হাত থেকে আমাকে কেউ লিয়ে যেতে পারবেক লাই। তুই আমার মরদ হচ্ছিস। সময় এলে দেখিয়ে দিস তোর লাঠির কারিগরি। বুধন মুচকি হেসে বলত - তুই ভাবিস না শঙ্করী। আমি বেঁচি থাকতি কোনও মরদ তুর দিকে তাকালে তার চোখ আমি গেলি দিব বুঝলি। শঙ্করী ওর বুকে মাথা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলত - আমি জানি রে বুধন। তাই তো তুরে আমি এত ভরসা করি। আমার ভয় ওই জমিদারের পো আমারি কোনোদিন উচ্ছিষ্ট না বানাই দেয়। বড় হারামজাদা পোলাটা। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে নিদ্রাদেবীর কোলে মাথা রেখেছিল তা মনেই নেই।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজে ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই দেখল ওর অর্ধেক দেহটা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে ঝুলছে। পায়ে একটা যন্ত্রণা অনুভব করল। চারিদিকে খালি বাঁচাও বাঁচাও আওয়াজ। বুঝতে বাকি রইল না যে ট্রেনটা অ্যাকসিডেন্টের শিকার হয়েছে। ভোরের আলো ফুটেছে। সেই আলোয় যতটুকু দেখা যায়, নিজেকে ধীরে ধীরে গাড়ির বাইরে বের করে নিয়ে এল বুধন। শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। বুঝতে অসুবিধে রইল না যে দুর্ঘটনাটা বেশ জোরালো হয়েছে। দেখল চারিদিকে খালি আর্তনাদ। শিশু এবং নর-নারীর বাঁচার জন্য আর্ত চিৎকার করে চলেছে। বুধন অনেক কষ্টে নিজেকে সোজা করে দাঁড় করাল মাটির ওপর। ঠিক মতো দাঁড়ানো যাচ্ছে না। রেললাইনের পাথরে পা পিছলে যাচ্ছে। দূরে তাকিয়ে দেখল বহুদূরে ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে তবে তারা খোঁজ

পেয়ে আসতে আসতে অনেকেই হয়তো প্রাণ হারাবে। বুধন আর দেরি না করেই, ট্রেনের ভেতর থেকে ক্ষত-বিক্ষত যাত্রীদের টেনে টেনে নামাতে শুরু করল। দেখল তার সাথে আরও কয়েকজন এসে যোগ দিয়েছে এই কাজে। এভাবে অনেকক্ষণ চলার পর ভোরের আলোয় দেখতে পেল দূরের গ্রাম থেকে বহু মানুষ ছুটে ছুটে এসেছে ত্রাণকার্যে সাহায্য করতে। এভাবে বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর নজরে পড়ল, ইতিমধ্যে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার এবং পুলিশের লোকেরাও এসে উপস্থিত। সাংবাদিকেরা লোকেদের ইন্টারভিউ নিতে ব্যস্ত। হঠাৎ মনে হল, গ্রামের লোকেরা যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বলছে, যে লোকটা এতগুলো লোকের জীবন বাঁচাল তার ইন্টারভিউ নিন। আমরা তো পরে এসেছি। কথাগুলো কানে যেতেই বুধন যেন সজাগ হয়ে গেল। ওরা কি তবে ওকেই খুঁজছে। এদিকে জল তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এসেছে। দেখল গ্রামের লোকেরা যারা এসেছে সকলেই হিন্দি ভাষাভাষী। তাই সকলেই হিন্দিতে কথা বলছে, হিন্দিতেই মন্তব্য করছে। বুধন একজনকে জিজ্ঞাসা করল - ভাই সাহাব, পিনে কা পানী কাঁহা মিলেগা? গ্রামের লোকটি তাকে দূরে একটা গাছ দেখিয়ে বলল - উধার চলে যাও, উহা এক টিউবওয়েল মিলেগা পানি পিনেকে লিয়ে। আর কোনো কথা না বলেই বুধন রেললাইন ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে সেই টিউবওয়েলের কাছে গিয়ে দু-হাত ভরে জল নিয়ে খেতে শুরু করল। এমনিতেই গতকাল রাতে পেটে কিছু পড়েনি তার ওপর শরীরের ওপর যা অত্যাচার গেল তা ভগবানই জানেন। ভগবানের কথা মনে হতেই, বুধন দু-হাত ভরে জল নিয়ে ভগবানকে উদ্দেশে বলতে লাগল - হে ভগবান, আমি যদি একটা পাপ করেও থাকি তবে এই এতগুলো লোকের জীবন বাঁচিয়ে যে পুণ্য করলাম তার জন্য কি তুমি আমায় ক্ষমা করবে না? বলতে বলতে তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

গল্পটা হয়তো এখানে শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তা হল না। হঠাৎ একটা হাত এসে বুধনের কাঁধে পড়তেই বুধন একেবারে চমকে উঠল। দেখল এক বয়স্ক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোক। বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছে। বৃদ্ধ লোকটি বলল - তুমকো দেখকে লাগতা হ্যায় তুম বহুত ভুখে হোঙ্গে। মেরে সে ঘাবড়াও মৎ। ম্যায় বগল মে হি রহতা হুঁ। তুহমে ট্রেন লাইনসে ভাগতে হুয়ে আতে দেখা। তুমকো দেখকে তো হামারা গাঁওকে নেহি লাগতে হো। জরুর তুম ট্রেন কে প্যাসেঞ্জার হোঙ্গে? বুধন মাথা নেড়ে সায় দিল। লোকটিকে দেখে বুধনের ভালো বলেই মনে হল। লোকটি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন - বেটা, হামারা গাঁও কে লোগ মুঝে রহিম চাচা বুলাতে হ্যাঁয়। তুম মেরে সাথ আ যাও। সরমাও মৎ। থোরা বহুত খা লেনা বেটা, নেহিতো কব ট্রেন ছুটেগি কোই ভরোসা নেহি। ইস্ মুসিবতমে আগার ম্যায় তুমহারা কোই কাম আউ তো মেরা ভাগ হ্যায় বেটা।

বুধন অবাক হয়ে শুনছিল রহিম চাচার কথা আর ভাবছিল, সত্যিই ভগবানই হয়তো এসময়ে রহিম চাচাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পেটের খিদেটা বারে বারে চাগাড় মেরে মেরে উঠছে। বুধন চালিয়ে নেওয়ার মতো একটু আধটু হিন্দি বলতে পারে। বলল - চলিয়ে জী।

রহিম চাচা বুধনকে নিয়ে গিয়ে পাশেই একটা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। বলল - ইয়ে মেরা কুটিয়া হ্যাঁ বেটা। বুধন দেখল রহিম চাচার ঘরে কেউই নেই। বুধন জিজ্ঞাসা করল - চাচা আপকো বাংলা সমঝমে আতা হ্যাঁয়? কিউকি ম্যায় হিন্দি ঠিকঠাক বোল নেহি পাতা হুঁ।

রহিন চাচা বললেন - বেটা তুম বাংলা মে বোল সাকতে হো। ম্যায় বহুতদিন কলকাত্তামে র‍্যাহে চুকা হুঁ। ম্যায় বাংলা সমঝ যাতা হুঁ।

বুধন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল - চাচা, তোমার কি কেউই নেই?

রহিম চাচা - এক টাইমপে সব থে, লেকিন আভি কোহি নেহি হ্যায়। ওহ্ এক বহুত বড়া কাহানি হ্যায় বাদমে সুনায়েঙ্গে। মেরি বিবি ভি বাঙালি থী।

বুধন - থী মানে? এখন বেঁচে নেই?

রহিম চাচা - নেহি বেটা।

রহিম চাচা প্রসঙ্গ বদলে বললেন - আচ্ছা বেটা তুমহারা নাম পুছনা তো ম্যায় ভুল হি গায়া। ক্যায়া নাম হ্যাঁয় তুমহারা।

বুধন - আমার নাম বুধন।

— আল্লাকি বহুত মেহেরবাণী হ্যায় কি তুম বাঁচ গয়ে হো। গাঁও কে লোগ বতা রহে থে কি বহুত লোগো কি মউৎ হো গয়ে। আল্লাকি লাখ লাখ সুকর হ্যাঁয় কি আপ বচ গয়ে হো।

বুধন মনে মনে ভাবল, রহিম চাচা, তুমি তো আমার কোনো কথাই জান না, তাই কৃপা আছে বললে কি করে। হতে পারে এর চেয়ে আরও বেশি কিছু বিপদ অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য।

— আপ পহলে খানা খা লিজিয়ে। ফির বাত করেঙ্গে।

একথা বলেই রহিম চাচা পাঁচটা রুটি, টক আচার সঙ্গে একটু টক দই আর তরকারি দিয়ে বুধনকে খেতে দিল। বুধন তখন খিদের জ্বালায় এক নিঃশ্বাসে প্রায় সব খেয়ে নিল। মনে মনে ভাবছিল রহিম চাচাকে হয়তো ভগবানই এসময়ে পাঠিয়েছেন, নয়তো সেইবা বেঁচে যাবে কেন আর এই অজানা জায়গায় খাবার দেবেন কেন। বুধনকে এভাবে খেতে দেখে রহিম চাচার বুঝতে অসুবিধে হল না যে বুধন খুবই ক্ষুধার্ত।

খাওয়া শেষ হলে রহিম চাচা বলল - বুধন বেটা, থোড়া সা বইঠ যাও। আরাম কর লো। ট্রেন আভি যানেওয়ালা নেহি। কুছ ঘন্টে তো লাগেগি দুসরা ট্রেন আনে মে। থোড়া আরাম কর লো। আপ কাঁহা যা রহে থে? আপকে ঘরমে কোন কোন হ্যায়?

— আমি গ্রাম বাংলার চাষির ছেলে। বলেই গ্রামের নামটা বলতে গিয়েও কেমন যেন আটকে গেল। ভাবল এখনই এই বুড়োকে সব কথা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু কাউকে মন খুলে সব কথা বলতে না পারলেও বুধন যেন শান্তি পাচ্ছিল না।

বুধনকে চুপ থাকতে দেখে রহিম চাচা বলে উঠলেন —

— আচ্ছা বুধন, আপকো ঘরকা জরুর ইয়াদ আ রাহা হোগা।

একথা শুনেই বুধন যেন কেমন ভেঙে পড়ল। সবকথা খুলে বলবে কিনা বুধন মনে মনে ভাবছিল। এমন সময় রহিম চাচা বলে উঠল - বেটা আপ মেরে সে কুছ ছুপা রহে হো। আপ ইতমিনান সে মুঝে আপকা দুবিধা বাতা সাকতে হো। ম্যায় আপকা বাপকা উমরকা হুঁ। কোই চিন্তা নেহি। ম্যায় হোতে হুয়ে কোই তুহমে হাত নেহি লাগা সাকথা ইস গাঁও মে। আউর আপতো মেরা মেহমান হো। আপ মুঝে বিসওয়াস কর সকতে হো। আপ মেরা মেহমান হো, আপকো কুছ নেহি হোনে দুঙ্গা। ম্যায় আল্লা কি কসম খাতা হুঁ।

বুধনের মনে হল চাচা যখন আল্লার দিব্যি খেয়েছে তাহলে হয়তো সব কথা খুলে বলা যেতে পারে। তাছাড়া সে অজানা অচেনা একজনকে এত উপকার করতে পারে সে আর যাই হোক খারাপ লোক নয়। গাঁয়ের বৃন্দাবন কাকার কথা মনে হল। তিনি বলতেন প্রয়োজনে তিন মাথার থেকে বুদ্ধি নিবি। অর্থাৎ বুড়োদের থেকে বুদ্ধি নেওয়া উচিত। মনে পড়ে বুধন জিজ্ঞাসা করেছিল। তিন মাথা আবার কি গো খুড়ো। খুড়ো বলেছিল - বুড়ো হলে দুটো হাঁটু ও মাথা প্রায় একসাথে ঠেকে যায়, তাই তিন মাথা বলে। তাহলে একবার সাহস করে রহিম চাচাকে বলেই দেখা যাক। যখন আল্লার দিব্যি খেয়েছে তখন নিশ্চয়ই তেমন কিছু করবে না। তাছাড়া গ্রামের প্রায় সবাই এখন ট্রেন দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। রহিম চাচা এতই বৃদ্ধ যে তার যাওয়া উপায় নেই তাই যেতে পারেনি। দেখলে মনে হয় সারা গ্রামটা যেন খাঁ খাঁ করছে। রহিম চাচাই সেখানে একা মানুষ। গ্রামের বুড়ো, বাচ্চা সবাই ছুটেছে অ্যাকসিডেন্ট দেখতে।

বুধন ভেবে দেখল তার এখন আর কোনও উপায় নেই। স্টেশনে গেলে খবরের কাগজওয়ালারা যদি ছবি ছেপে দেয় বা পুলিশে নানা জেরা করে তা হলেও বিপদ। তাই রহিম চাচাকেই বিশ্বাস করে দেখা যাক।

বুধন ধীরে ধীরে সব কথা রহিম চাচাকে খুলে বলল। এও বলল যে সে জানে না যে জমিদারের ছেলে নন্দ বেঁচে আছে না মরে গেছে। সব কথা শুনে রহিম চাচা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল - আপ দুসরী সাইড সে ট্রেন লেকর গাঁও ওয়াপস যাও বেটে। শঙ্করী কো বহুৎ জরুরত হ্যায় তুমহারা। হো সাকতা হ্যায় নন্দ মরা নেহি। তুম আউর দের নেহি করনা বেটে আভি চলে যাও। যাকে দেখ উহা কি হালত, শঙ্করীকে হালত ক্যায়া হ্যায়। তুমহারা একেলে আনা ঠিক নেহি হুয়া বেটা। তুম আভি নিকল যাও।

আগলা স্টেশন সে ট্রেন চড়না। ইহা সে পাঁচ মিনিট কি রাস্তা হ্যায়। ইস টাইমপে কলকাত্তা যানেকে লিয়ে ট্রেন আতি হ্যায়। উসমে চড় যানা।

বুধন কি করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা অন্য স্টেশনে গিয়ে একটু অপেক্ষার পর ট্রেন পেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত গ্রামের স্টেশনে নেমেই দৌড়ে গেল মন্টুদার চায়ের দোকানে। মন্টুদাও ওর পাশের বাড়িতেই থাকে। মন্টুদা বুধনকে দেখেই টেনে চায়ের দোকানের পেছনে নিয়ে গেল।

বলল - বুধন, তুই কোথায় ছিলি? এই একটু আগে শঙ্করীকে জমিদারের লোকেরা পাগল প্রমাণ করে মানকুণ্ডু পাগলাগারদে ভর্তি করতে নিয়ে গেল। সবাই বলছে শঙ্করী নাকি পাগল হয়ে গিয়ে নন্দকে মাথায় দরজার খিল দিয়ে মেরেছে। নন্দ এখন হাসপাতালে। বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। কিছুই বলতে পারছে না। শঙ্করীকে ওরা একটু আগে টানতে টানতে নিয়ে গেল। শঙ্করী চিৎকার করে বলছিল - তুই আমাকে বাঁচা বুধন। ইরা আমাকে মেরি ফেলবে। সে কি আর্তনাদ রে বুধন। আমি তোকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি। কোথাও পাইনি।

বুধন যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ চিতা বাঘের মতো চিৎকার করে উঠল। উরা আমার শঙ্করীকে লিয়ে গেছে, আমি উদের ছারবেক লাই। মন্টুদা, আমি যাচ্ছি গো, শঙ্করীকে আমার বাঁচাতিই হবে। মন্টুদা বলল - তুই যা, আমি গ্রামের মানুষগুলোরে লিয়ে আসছি এর একটা বিহিত আজ করতিই হবে।

বুধন পাগলা ঘোড়ার মতো শঙ্করী আমি আসছি বলতে বলতেই ছুটতে শুরু করল... কানে ভেসে আসতে লাগল বুধনের গগনভেদী চিৎকার, আমি আসছি শঙ্করী... আমি আসছি... তুর কুনো ভয় লাই, আমি আসছি তুর কাছে... তুকে আমি মরতি দিব না ওই পিশাচগুলার হাতে... আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে উঠল কালবৈশাখী ঝড়।

সৃজনী - সঙ্গীত, নৃত্য ও আঁকা শিক্ষা

কত্থকঃ শুক্রবার বিকেল ৫:০০ টা

ভারত নাট্যম ঃ সোমবার ১১:৩০টা, বুধবার ০৪:৩০টা, শুক্রবার ০৪:০০টা, শনিবার ০৫:০০টা

শাস্ত্রীয় কন্ঠ সঙ্গীতঃ বৃহস্পতিবার ০৪.৩০টা, রবিবার ১১.৩০টা | **রবীন্দ্র সঙ্গীত**ঃ শুক্রবার ১২:০০টা

যন্ত্র সঙ্গীতঃ সোমবার ০৪.৩০ মিঃ | **চারুকলা / আঁকা** ঃ রবিবার ১০:০০টা

প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবরের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

কালীবাড়ি অফিস ঃ

0120-4547375 9891384356

9990332552 | 9811321716 | 92266533809

শহরতলি থেকে শহর

গার্গী চট্টোপাধ্যায়

কি করে কলকাতা হল, সে গল্প প্রায় কারুরই অজানা নয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার বাণিজ্যের প্রসারের জন্য কলকাতা নামক গ্রামকে বন্দর শহরে রূপায়িত করেছিল — এর অন্যতম কারণ ভাগীরথী হুগলি নদীর নাব্যতা ও বন্দর হিসেবে কলকাতার কিছু সেখানে বিশেষ সুযোগ সুবিধা। হুগলি বন্দরের পড়ন্ত অবস্থা, তাতে গভীরতার অভাব ও সেখান থেকে দক্ষিণে সরে এসে মোগলদের অত্যাচার থেকে দূরত্ব বজায় রাখাও ছিল কারণ। পরবর্তীতে লন্ডনের পরে ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম শহর ও তারপর ১৯১১ অবধি রাজধানী হিসেবে তার প্রাধান্য সম্বন্ধে আমরা অবগত। তাই ঠিক কলকাতার গল্প আর করবো না। করবো এক অঞ্চলের গল্প, যার যাত্রাপথ শুরু হয় কলকাতার একটি শহরতলি হিসেবে, যদিও ১৮৮৮ তে আরও কিছু শহরতলির সঙ্গে তা শহর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কলকাতার সঙ্গে পরিচিত মানুষদের কাছে সেই অঞ্চলটি খুবই চেনা, নাম তার বালিগঞ্জ।

অধুনা বালিগঞ্জ কলকাতার দক্ষিণে একটি বর্দ্ধিষ্ণু এলাকা যেখানে মধ্য ও উচ্চবিত্ত মানুষের বাস। ১৮০০ শতকের মানচিত্রে আমরা যে বালিগঞ্জকে পাই, আজকের সেই অঞ্চল তার সঙ্গে খাপে খাপে মিলবে না। আধুনিক বালিগঞ্জের বিস্তৃতি হল উত্তরে পার্ক সার্কাস ও দক্ষিণে রবীন্দ্র সরোবরের মধ্যে এবং এই এলাকার পূবদিকে আছে কসবা ও বালিগঞ্জ স্টেশন আর পশ্চিমে ভবানীপুর। আপজন সাহেবের ১৭৯৩-’৯৪ ম্যাপে আমরা যে বালিগঞ্জকে দেখি, তার অবস্থান ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের বিস্তীর্ণ ডিহি চক্রবেড়ের মধ্যিখানে।

যদিও কলকাতার অভ্যুত্থান ও জব চার্ণকের ভূমিকা বহু আলোচিত, কলকাতার অস্তিত্ব চার্ণকের আগমনের আগেই ছিল। পরবর্তীতে বিবিধ কারণে তা শহর ও বন্দর হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে। বালিগঞ্জের সম্বন্ধে আলোচনার বিস্তৃতি কিন্তু আপজনের ম্যাপের সময় থেকে, হয়তো বা তারও একটু প্রাক্কাল থেকে।

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহ ইংরেজদের প্রবল প্রতাপকে রোধ করার জন্য পলাশীর যুদ্ধের অনতিপূর্বে ১৭৫৬ সালের জুন মাসে কলকাতা আক্রমণ করেন। ফোর্ট ইউলিয়ামের চারধারে ইংরেজরা নবাবের অনুমতি ছাড়া প্রাকার গড়ে তুলছিল। তাই সিরাজের গোঁসা হল। এই যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যন্ত এবং অশ্রুত স্থান বালিগঞ্জের একটা যোগাযোগ ছিল এমন কথা বইয়ে লেখা আছে। এই যুদ্ধে নবাবের সৈন্য ইংরেজদের হারিয়ে দিয়েছিল — তার পরই ক্লাইভ পলাশীর পরিকল্পনায় তৎপর হন। কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

নবাবের বিশাল পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী, ১৮,০০০ ঘোড়া, চল্লিশটি কামান, ১০,০০০ বিলদার, অনেক হাতি ও আরও অনেক নবাবের দলের মানুষ কলকাতার উপকণ্ঠে জমায়েত হল। নাকি তারা মারাঠা ডিচের অপর প্রান্তে ঘাঁটি গেড়েছিল। নবাবের বিশাল সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য চারণ ক্ষেত্রের সন্ধানে ব্যাপক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক অংশ নাকি প্রত্যন্ত বালিগঞ্জের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ঘোড়ার জন্য তৃণক্ষেত্রের সন্ধানে পেয়েছিল।

এরপর বালিগঞ্জের কথা আমরা পাই ১৮০১ সালের কোম্পানীর নথি থেকে যখন ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানীর অফিসাররা বড়লাট সাহেবের Body Guard-দের জন্য ক্যান্টনমেন্ট (সেকালে যা Governor General's Body Guard Line বা GGBGL বলে পরিচিত ছিল) নির্মাণের জমির সন্ধান

করছিলেন ওই অঞ্চলে। সেই ক্যান্টমেন্ট এলাকা আজও বালিগঞ্জ ময়দান ক্যাম্প নামে স্বমহিমায় বিরাজ করছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ব্যাপক অংশে।

১৮ শতকের শেষ থেকে কোম্পানী তার প্রসার ও প্রতাপ বাড়ানোর জন্য সাধারণভাবে নতুন নতুন জমি অধিগ্রহণে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজরা ১৭৯৪- এর ১০ই সেপ্টেম্বরে মারাঠা ডিচকেই কলকাতার সীমানা ঘোষণা করেছিল। বাংলার নবাব আলিবর্দী খান নাগপুরের মারাঠা ভোঁসলেদের বর্গী বাহিনীর নিয়মিত আক্রমণে নাজেহাল হচ্ছিলেন। বর্গীদের হাত থেকে কলকাতাকে রক্ষা করার জন্য কোম্পানী এটি খনন করায়। মারাঠা ডিচের বিস্তৃতি ছিল বাগবাজার থেকে এন্টালি অবধি। পরবর্তীতে সার্কুলার রোড তৈরি করার জন্য এটি বুজিয়ে ফেলা হয়। অধিগৃহীত নতুন নতুন স্থান শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল (fringe) বা শহরতলি (suburb) হিসেবে চিহ্নিত ছিল, যেগুলির সমষ্টি পঞ্চান্নগ্রাম নামে পরিচিত ছিল।

বালিগঞ্জের মধ্যে বিস্তৃত অংশ বেছে নেওয়া হল বড়লাট সাহেবের অশ্বারোহী বাহিনীর স্থায়ী অবস্থানের জায়গা হিসেবে। তৎকালীন কোম্পানীর কাগজপত্রে ইংরেজি ভাষায় বালিগঞ্জের বিবিধ বানান পাওয়া যায় — Ballygunge, Ballygunj, Balleegunge, Balloogunge ইত্যাদি। ১৭৭৩ সালেই বাংলার প্রথম গভর্নর জেনেরাল ওয়ারেন হেস্টিংস মুগল সৈন্যদের মধ্যে তুখোড় পঞ্চাশজনকে বেছে নিয়ে দেহরক্ষী বাহিনী বা Body Guard Regiment গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে এপ্রিল ১৮০০ সালে Madras Cavalry-র ১৬৮ জন সৈন্যকে এতে সামিল করা হয়। ১৮০১ সাল থেকে কোম্পানী জমি অধিগ্রহণে মনোনিবেশ করে ও তাই বালিগঞ্জকে বেছে নেওয়া হয়।

সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেকালের কলকাতার তুলনায় অনেক খালি ও জঙ্গলাকীর্ণ হলেও সেখানে মানুষের বসতি যে একেবারে ছিল না, এমনটাও নয়। তৎকালীন কিছু বাসিন্দাদের নাম ইংরেজ দপ্তরের দলিলে পাওয়া যায় — তাদের মধ্যে মুসলিম, খ্রীস্টান আর হিন্দু নাম আছে। ১৮০১ সালের সেই দলিলে এও বলা আছে যে এদের থেকে ৬৭ বিঘা ১ কাঠা ২ ছটাক জমি কোম্পানী অধিগ্রহণ করবে। এরকম বেশ কয়েক দফায় জমি নেওয়া হয়েছিল।

আশেপাশের আরও কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন ভবানীপুর, টালিগঞ্জ, আলিপুর প্রভৃতির মতো বালিগঞ্জ ছিল জলাজঙ্গল অঞ্চল যেখানে ছোট ছোট চালাঘরের বসতি বা ক্ষুদ্র গ্রাম ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাই কলকাতার সীমানার মধ্যে যেসব কাজ কর্ম নিষিদ্ধ ছিল, এইসব স্থানে সবার চক্ষুর অন্তরালে তা সম্পন্ন হত। যেমন সতীদাহ। আইন করে তখনও রদ করা না হলেও (বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮২৯-এর ডিসেম্বরে আইন করে হিন্দু বিধবাদের মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় মৃত্যুবরণের প্রথাকে বন্ধ করেন) ১৮১৯-এর তথ্য অনুযায়ী কলকাতার সীমানার মধ্যে তা ছিল নিষিদ্ধ। তবে শহরতলিতে বসবাসরত শিক্ষিত ও কর্মরত ইংরেজ অন্তত সপ্তাহে একদিন কাশিপুর, গার্ডেনরিচ, আলিপুর, বালিগঞ্জ এলাকায় এমন ভয়ানক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন।

যাইহোক, GGBGL নির্মাণের জন্য জমির ব্যাপারে অসংখ্য চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলেছিল দফায় দফায়। ১৮০১ থেকে কোম্পানী উদ্যোগী হলেও ও প্রস্তুতি পর্ব চললেও পরে ধীরে ধীরে GGBGL আয়তনে বৃদ্ধিলাভ করে ও তার মধ্যে নানান পরিবর্তন করা হয়। সেই বিশদ বৃত্তান্তে যাব না। তবে চিঠিপত্রের একটি প্রধান বিষয় ছিল জমির দাম নির্ধারণ ও বিক্রেতাকে তার ক্ষতিপূরণ।

ক্যান্টনমেন্ট বানানোর আগে জঙ্গল এলাকার বিভিন্ন বিশাল বিশাল গাছ কেটে ও জলা জায়গার ঘাসজমি অনেকাংশে সাফ করা হয়। এই এলাকায় প্রচুর বাঁশঝাড় ছিল, যেগুলি নির্মূল করা হয়। বালিগঞ্জ এলাকা স্বাস্থ্যকর ছিল না, জঙ্গল, গাছ ও জলাভূমির কারণে তা ছিল মশা ও ম্যালেরিয়া কবলিত অঞ্চল। তাই জঙ্গল সাফ করার এক অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্যাঁতস্যাঁতে ছায়াময় জমিতে মুক্তবায়ু খেলতে দেওয়া ও সূর্যের রোশনাইয়ের সরাসরি প্রবেশ। ১৯ শতকের প্রথমদিকের জমির দলিলেও কিন্তু বালিগঞ্জকে বর্ণনা করা হয় বিস্তীর্ণ অস্বাস্থ্যকর জলাজমি এলাকা বলে। যাতে মাঝে মধ্যে কিছু কুটীর, চাষজমি ও বাগান রয়েছে। তাই বলা হয়েছিল ওখানকার জমির মূল্য পতিত জমির চেয়ে বেশি নয়। আবার GGBGL নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত ইঁটের প্রয়োজন হেতু যত্রতত্র মাটি কুপিয়ে ফেলা হয়। তাতে জমা হতো গাছপালার

পরিত্যক্ত পাতা, শুকনো ফুল ও উড়ে আসা আবর্জনা। সেইসব গর্ত ছিল অ্যানোফিলিস মশার স্বর্গরাজ্য। কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সুরা, এন্টালি, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দূষিত আবহাওয়া কিছুটা হলেও দায়ী ছিল। এইসব অঞ্চলের জমিতে গর্ত খুব বেশি ছিল ও তৎসহ জলনিকাশী ব্যবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। সাধারণভাবে তৎকালীন কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল এক কথায় অস্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়া ব্যতিরেকে কলেরা ও আমাশয়ের প্রকোপে মানুষ কাবু হতেন। ইংরেজ দপ্তরের দলিল দস্তাবেজে বালিগঞ্জকে 'Jungly' বিশেষণে বিভূষিত করা হয়।

তাহলেও GGBGL এর কাজ তো বিভিন্ন পর্যায়ে চলছিল। ক্যান্টমেন্টের মধ্যে নানান ভবন, ছাউনি ইত্যাদি মাথা তুলেছিল। ক্যান্টমেন্টের সীমারেখার বাইরে আশেপাশে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় বসতি গড়ে উঠছিল। ১৭৫৬ থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে কলকাতায় বসবাসকারী ইউরোপীয়দের সংখ্যা নাকি প্রায় ৩০০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (৩০০ থেকে ৯,০০০)। আলিপুর, বালিগঞ্জের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত পরিস্কার ও স্বাস্থ্যকর এলাকাতে ইউরোপীয় যাদের আগমন ঘটে - অনেকেই ছিলেন ভাড়াটিয়া, অনেকে মালিক। বর্ধিষ্ণু বাঙালিরাও কয়েকজন এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রবিঠাকুরের মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি প্রথম ভারতীয় IAS ছিলেন। কলকাতার থেকে একটু কম দামে বাগানঘেরা বড় বাড়ি তাঁরা শহরতলিতে পেতেন। বালিগঞ্জের উত্তর অঞ্চলে নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত উঁচু জমিতে GGBGL-এর আশেপাশে বাগানবাড়ি যুক্ত সুন্দর পাড়া গড়ে ওঠে। ক্যান্টমেন্টের নিকট উপস্থিতি মানুষের মনে নিরাপত্তা জোগাতো তা বলাই বাহুল্য। ইংরেজ লেখিকা এমিলি ইডেন কলকাতাতে অন্ততঃ বার দুই এসেছিলেন। মে ২৮, ১৮৪০-এ লিখিত একটি চিঠিতে তিনি কলকাতার অদূরে স্থিত বালিগঞ্জকে লন্ডনের অভিজাত এলাকা এলথাম-লুইস্যামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ৩০ বা ৪০-এর দশকের ক্যান্টনমেন্ট লাগোয়া এলাকার আপাত আভিজাত্যতে তিনি নিশ্চিত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাহলে কি বলা যায়, বালিগঞ্জেও কলকাতার মতো ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে whitetown গড়ে উঠেছিল?

তবে ১৯ শতকের দ্বিতীয় দশকে জেমস রেনল্ড মার্টিন নামক এক ইংরেজ মিলিটারি ডাক্তার GGBGL-এ এসেছিলেন অধিবাসীদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী ক্যান্টমেন্টের নিকটবর্তী এলাকায় বালিগঞ্জে তখনও জঙ্গল ও বাঁশঝাড়ের আধিক্য ছিল। তাছাড়া নিকাশি ব্যবস্থা তেমন ভালো কাজ করতো না সবসময়। ফলে সেনা ও কর্মচারীরা প্রায়শঃই ঘুসঘুসে জ্বরে হতো বেজায় কাবু। তবে ১৮২৫ এর মধ্যেই নাকি ক্যান্টমেন্টের সীমার বাইরে বালিগঞ্জ 'বাজার' গড়ে উঠেছিল। তাহলেও ১৮০০ সালের থেকে হয়তো ধীরে ধীরে অবস্থা একটু ফিরছিল যে কারণে পরবর্তীতে সুন্দর বাংলো গড়ে উঠছিল ও ইউরোপীয় ও অভিজাত সরকারি আমলা সম্প্রদায়ের বাঙালিরা বালিগঞ্জে বাস করতে শুরু করেছিলেন।

১৯ শতকের প্রথম থেকে ২০ শতকের গোড়াতে বালিগঞ্জে GGBGL-এর নিকটবপর্তী স্থানে ইউরোপীয় ও ইন্দো ইউরোপীয় বসতি গড়ে ওঠে যা পূর্ব থেকে দক্ষিণে এক wedge আকৃতিতে বিস্তারিত হয়। এসব অঞ্চল ছিল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, ক্যুইনস পার্ক, ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস বালিগঞ্জ স্টোর রোড প্রভৃতি।

এফ এম সিমস্ (১৮০৩-'৬৪) নামক জনৈক সার্ভেয়ার কলকাতার জরিপ করে এক মানচিত্র তৈরি করেন (১৮৪৭-'৪৯)। বালিগঞ্জে বলতে GGBGLকে নির্ধারণ করা হয়। প্রধান ইমারতের মধ্যে ছিল বডিগার্ড আস্তাবল ও হাসপাতাল। GGBGL-এর গা ধরে পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে ছিল বালিগঞ্জ রোড, যেটি দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে মিলিত হয়। বালিগঞ্জ লাইনস্‌কে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ওই সার্কুলার রোড ঘিরে রেখেছিল। GGBGL-এর দক্ষিণে গড়ে ওঠে বালিগঞ্জের হাট।

এরপর ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের দ্বারা মুদ্রিত ১৮৭৭ সালের কলকাতার মানচিত্রে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আরও বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। বালিগঞ্জের বিস্তৃতি তখন রাইফেল স্যুটিং রেঞ্জ থেকে পূর্বে ঘুঘুডাঙার মেন রোড অবধি আর অন্যদিকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে উত্তরে ওল্ড বালিগঞ্জ ফার্স্ট লেন পর্যন্ত। শেষের রাস্তা একটু দক্ষিণমুখী হয়ে বালিগঞ্জ স্টোর রোডে পড়েছে, যা মানচিত্র অনুযায়ী পশ্চিমে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে মিলিত হয়েছে।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ছিল GGBGL-এর দক্ষিণ সীমানা। বেশ কিছু চওড়া রাস্তা ক্যান্টমেন্টের এদিক থেকে ওদিক একে অপরের উপর (+) এভাবে গিয়েছে। ক্যান্টনমেন্টে রয়েছে হাসপাতাল, রক্ষীদের গৃহ ও বারুদখানা। উত্তর পশ্চিম কোণে ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন বালিগঞ্জ হাট। ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে দেখা যাচ্ছে বালিগঞ্জ থানা আর ওল্ড বালিগঞ্জ মার্কেট। আরও দেখা যাচ্ছে বালিগঞ্জ ক্রিকেট মাঠ ও তার জমি ক্যান্টনমেন্টের জমি সংলগ্ন বা একই বিস্তৃত জমি। ১৮৮৪-তে প্রকাশিত রামনাথ দাসের 'কলিকাতার মানচিত্র' নামক পথ নির্দেশিকা ও মানচিত্রে কলকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল হিসেবে প্রায় পাশাপাশি বালিগঞ্জ, চক্রবেড়ে আর গড়চা রয়েছে। ক্যান্টনমেন্টের পাশে পুরানো বালিগঞ্জের বাজার ও বালিগঞ্জের হাট দুই-ই রয়েছে। ১৮৮০র দশকে কলকাতার মানুষের স্বাস্থ্য ও শহরের পরিচ্ছন্নতার উন্নতি সাধনার্থে শহরের পৌর সীমারেখাকে বাড়ানোর পরিকল্পনা হয়। ১৮৮৮ সালে পঞ্চান্নগ্রামের অনেকাংশ যা কলকাতার পূর্ব ও দক্ষিণে অবস্থিত ছিল - কলকাতা শহরে সংযুক্ত হল। বালিগঞ্জ তার মধ্যে অন্যতম।

১৮৪৮ সালের সরকারি নথিতে বালিগঞ্জের মধ্যে একটি ক্যানাল নিয়ে পর্যালোচনা হয়। সমসাময়িক এই সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়। এই ক্যানাল হয়তো বা কোনও আদি নদীর খাত যা স্থানীয় চলাচল ও মাল সরবরাহের জন্য বার কয়েক সংস্কার করার চেষ্টা হয় ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এর উপর একটি সরু চড়া পড়েছিল যা ছিল বাঘ অধ্যুষিত এলাকা। নদীর মাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রায় দেওয়া হয় তা সুন্দরবনের মাটিরই মতো ও খনন করে বহু পুরানো বিশাল গাছপালার গুঁড়িও পাওয়া যায়। কাজেই বাঘের উপস্থিতি অবিশ্বাস্য কিছু নয়। বালিগঞ্জ প্লেসের কতিপয় বৃদ্ধ মানুষ ৭০ দশকের গোড়ায় গল্প করতেন যে রাতে ছাদ থেকে বাঘের গর্জন শোনা যেত। কিন্তু তা মৌখিক ইতিহাস মাত্র।

বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন বালিগঞ্জ গিয়েছিলেন, ততদিনে বালিগঞ্জ শহর কলকাতার অঙ্গাঙ্গীন অংশ - যদিও কেবল স্টোর রোড ও সানি পার্কের আশেপাশে কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছিল। বাকী বালিগঞ্জ ছিল গ্রাম্য প্রায় জনহীন ও অনুন্নত। হিন্দুস্থান রোড ও তার সংলগ্ন স্থানে দেখা যেত ধানক্ষেত।

সাহিত্যিক প্রতিভা বসু ও তাঁর স্বামী অধ্যাপক, কবি, লেখক বুদ্ধদেব বসু বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বালিগঞ্জ অঞ্চলে বসবাস করতেন। শহর কলকাতার অংশ হলেও বালিগঞ্জ তখনও গ্রাম্য - যদিও সুন্দর সুন্দর কিছু অট্টালিকায় তা শোভিত হতে শুরু হয়। তবে সেসব বাড়িতে অনেক সময় ভাড়াটিয়া পাওয়া যেত না। ছিল প্রবল মশার উপদ্রব। প্রতিভা বসু তাঁর 'স্মৃতি সততই সুখের' নামক আত্মকথন ধরণের গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন যে বালিগঞ্জ এমন এক জঙ্গল যেখানে দিনের বেলায় শেয়াল দেখা যায় ও রাত্রিবেলা বাঘ। প্রথম দিকে তাঁদের বসতবাড়ির সংলগ্ন একটি জঙ্গল ছিল। একটু এগিয়েই পায়ে হাঁটা পথে কাছে ছিল গড়িয়াহাট যা বালিগঞ্জ সংলগ্ন এক জমজমাট মার্কেট, যার দুপাশে তখনও বিস্তীর্ণ মাঠ ও দুর্গন্ধময় জলাশয়।

পরিশেষে বালিগঞ্জের এহেন নামকরণ সম্বন্ধে দু এক কথা বলা যেতে পারে। বালিগঞ্জ ক্যানাল কয়েকবার খনন করার সময় কোম্পানীর অফিসাররা দেখেন অতি অল্প সময়েই ক্যানাল বা মরা নদীর জল শুকিয়ে গিয়ে বালুকাময় শুকনো খাত তৈরি হচ্ছে। তাদের ধারণা এই 'বালু' থেকে Balloo Gunge নাম হয়। মৌখিক ইতিহাস অনুযায়ী আবার সেই অঞ্চলের কিছু জমি ছিল বালুকাময় ও সেখানে নাকি বালির গঞ্জ গড়ে উঠেছিল।

তথ্যসূত্র

1) Kathleen Blechynden, Calcutta Past & Present, London, 1905
2) A. K. Roy, Census of India, Volume 7 , Calcutta; Town & Suburbs, A Short History of Calcutta, - Part 1, Calcutta, 1902
3) H.E.A. Cotton, Calcutta Old & New, A Historical and Descriptive Handbook to the City, Calcutta, 1907
4) West Bengal State Archive, Revenue (Miscellaneous)
5) West Bengal State Archive, Judicial (Criminal)

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
২০২৬-২০২৭ বৎসরের উৎসব ও অনুষ্ঠান (১৪৩৩)

১৫ই এপ্রিল, ২০২৬ বুধবার	ঃ	বাংলা নববর্ষ ।
২০শে এপ্রিল, ২০২৬ সোমবার	ঃ	মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস ও অক্ষয় তৃতীয়া। বিশেষ পূজা সকাল ০৯:০০ টায়।
৯ই মে, ২০২৬ শনিবার	ঃ	সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ০৮:০০ টায়।
১০ই মে, ২০২৬ রবিবার	ঃ	রবীন্দ্র জয়ন্তী (কবিপ্রণাম) সকাল ০৬:০০ টায়।
১৫ই আগস্ট, ২০২৬ শনিবার	ঃ	স্বাধীনতা দিবস - পতাকা উত্তোলন সকাল ১১:০০ টায়।
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার	ঃ	শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও উৎসব।
১৫ ইসেপ্টেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলবার	ঃ	গণেশ পূজা
৯ই অক্টোবর, ২০২৬ শুক্রবার	ঃ	মহালয়া, অমাবস্যা
১৬ই অক্টোবর, ২০২৬ শুক্রবার হইতে ২১শে অক্টোবর, ২০২৬ বুধবার পর্য্যন্ত	ঃ	শারদোৎসব ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ।
২৫শে অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার	ঃ	কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা — সন্ধ্যা ০৮.৩০ মিঃ।
৩১শে অক্টোবর, ২০২৬ শনিবার	ঃ	বিজয়া সম্মেলন — রাত্রি ০৯.০০ টায়।
৮ই নভেম্বর, ২০২৬ রবিবার	ঃ	শ্রীশ্রী কালী পূজা — রাত্রি ১১.০০ টায়।
১৮ই নভেম্বর, ২০২৬, বুধবার	ঃ	শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা।
০৯-১০ই জানুয়ারী, শনিবার ও রবিবার ২০২৭	ঃ	পৌষ মেলা উৎসব ও বইমেলা।
২৩শে জানুয়ারী, ২০২৭ শনিবার	ঃ	নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের জন্মদিন - প্রতিচ্ছবিতে মাল্যদান।
২৪শে জানুয়ারী, ২০২৭ রবিবার	ঃ	বার্ষিক বনভোজন (পিকনিক)
২৬শে জানুয়ারী, ২০২৭ মঙ্গলবার	ঃ	প্রজাতন্ত্র দিবস — পতাকা উত্তোলন সকাল ১১:০০টায়
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ বৃহস্পতিবার	ঃ	শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা
৬ই মার্চ, ২০২৭ শনিবার	ঃ	শ্রীশ্রী শিবরাত্রি ও ব্রত।
২২শে মার্চ, ২০২৭ সোমবার	ঃ	দোল পূর্ণিমা
১৩ই এপ্রিল - ১৬ই এপ্রিল, ২০২৭	ঃ	বাসন্তী দুর্গা পূজা

বাংলা নববর্ষ আরম্ভ ১৪৩৪ (১৫/৪/২০২৭), বৃহস্পতিবার

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের বাংলা ত্রৈমাসিক মুখপত্র সমন্বয় প্রকাশিত হচ্ছে।
নয়ডাবাসীদের কাছ থেকে রচনা, গল্প, কবিতা আহ্বান করা হচ্ছে।।

ক্রিকেট টুর্নামেন্টে টীম NBCA

মন্দিরে বসন্ত উৎসব উদযাপন

মন্দিরে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ভক্তদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

রামকৃষ্ণ মিশনের জ্যোতিস্বরূপানন্দজি মহারাজের উপস্থিতিতে মন্দিরে আয়োজিত কল্পতরু উৎসব

পৌষমেলা ও বইমেলার সাহিত্য আলোচনা সভায় সমন্বয়ের শীত সংখ্যার শুভ উন্মোচন

সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে হাতেখড়ি অনুষ্ঠান

বাসন্তী পুজোতে কুমারী মাতার পুজো

Published by Satyaki Guha, Secretary, Noida Bengali Cultural Association, Sector 26, Noida, G B Nagar (U.P) and printed by New Delhi Paper Products,C R Park, New Delhi .